জীবন জাগার গল্প—১২

ডানামেলা সাহওয়া

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

ডানামেলা সালওয়া

জীবন জাগার গল্প : ১২

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

তারজামাতু মা'আনিল কুরআনিল কারীম, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

শুরুর কথা

সালওয়া? তোমার নাম বুঝি সালওয়া! ভারি সুন্দর নাম তো! শব্দটার মধ্যে কেমন যেন 'হালওয়া (হালুয়া)-হালওয়া' ভাব আছে। শুনলেই জিবে মিষ্টি মিষ্টি উমমমম আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। ঢোক গিললে গলায় যষ্টিমধুর আভাস পাওয়া যায়! কারও নাম সালওয়া সেই প্রথম শুনলাম। ফুটফুটে মামণিটা তার বুলবুলির ঝুঁটির মতো করে বাঁধা চুল দুলিয়ে বলল :

-আমার নাম সালওয়া!

সালওয়া? আমি রীতিমতো হালওয়া হয়ে গেলাম। হালুয়া বললে, মনের পর্দায় ভেসে ওঠে একটা গোলগাল অবয়ব। ঝুঁটিদার বুলবুলিটাও একেবারে গোলগাল! তখন অবশ্য 'সালওয়া' শব্দের অর্থ জানতাম না। এটুকু জানা ছিল, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্যে আকাশ থেকে পাঠাতেন। হালুয়া-জাতীয় কিছু একটা হবে হয়তো! অজ্ঞ মনের কল্পনা থেকেই মেয়েটাকেও হালুয়ার সাথে মেলাতে মন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মাঝেমধ্যে মনের আজব কাজ-কারবার দেখলে রীতিমতো ভিরমি খেতে হয়! সেই এতটুকুন একরত্তি বেণিদোলানো পিচ্চি সালওয়া এখন হয়তো আরও অনেক সালওয়ার হালুইকর বনে গেছে!

সালওয়া (السلوى) তিতির-জাতীয় পাখি। শব্দটা কুরআন কারীমে তিনবার এসেছে। তিনবারই একই অর্থে। শব্দটার মূল অর্থের মধ্যে সুখী জীবনযাপন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের ভাব আছে। নরম-কোমল ভাব আছে। ইবনে ফারেস রহ. এমনটাই বলেছেন।

যা মানুষকে শান্তি দেয়, স্বস্তি দেয়, দুঃখ-শোক দূর করে, সেটাকেই সালওয়া বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন সালওয়া অর্থ মধু। কেউ বলেছেন সালওয়া অর্থ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা উদ্ভিদ ও গোশত-জাতীয় রিযিক। যাক, শব্দটা নিয়ে বেশি টানাটানি করলে মিষ্টিটা তেতো হয়ে যেতে পারে। আপাতত আভিধানিক কচকচি পাশে সরিয়ে রাখা যাক!

তিতির কি ডানা মেলে? নাদুসনুদুস! হোঁতকা বললে খারাপ শোনায় তাই বলা গেল না। দেখতে মোরগের মতোই! বনী ইসরাঈলকে আসলেই এই পাখি দেয়া হয়েছিল? নাকি সালওয়া অন্য কোনো পাখি? কোন বয়েসের তিতির? পরিণত বয়েসের হলে, একজন কি একটা 'সালওয়া' খেয়ে শেষ করতে পারত? সালওয়া কি রান্না করা থাকত? কাঁচা কচকচে? ভুনা (حَنِيذ)? ইবরাহীম আ. মেহমানদের জন্যে ভুনা গো-বৎস (عِجْلٍ حَنِيذ) নিয়ে এসেছিলেন। তা হলে কি ধরে নেব সালওয়াও ভুনা ছিল! আল্লাহ তা'আলাও চান মেহমানকে ভুনা গোশত পরিবেশন করা হোক! তার খলীল তা-ই করেছেন তো! এই দেখো, কথাবার্তা কীভাবে

খাবার-দাবারের দিকে মোড় নিচ্ছে! খাবার দেখলে পেটটা আনচান করে উঠলে, খাবারের আলোচনা লিখতে হাতটা নিশপিশ করবে না কেন? আর খাবারের গন্ধে যদি অর্ধভোজন হয়, খাবারবিষয়ক লেখায় অর্ধাস্বাদন হতে বাধা কোথায়! থাক জিবে জমা জল গিলে ফেলা যাক! আলোচনার মোড় ভিন্নখাতে বইয়ে দেয়া যায় কি না দেখা যাক!

সালওয়া ছিল সরাসরি আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। আমরা এমন রহমত থেকে বঞ্চিত। এ জন্য বনী ইসরাঈলের কিছু দুষ্ট লোক দায়ী। তারা জান্নাতী খাবারে সন্তুষ্ট থাকলে, আমাদের ভাগ্যেও হয়তো খাবারটা জুটত! খাবারের কথা থাক, এ ছাড়া আরও কত কত নেয়ামতে আল্লাহ আমাকে ডুবিয়ে রেখেছেন, কই আমি সেগুলোর যথাযথ শুকরিয়া আদায় করছি?

বাস্তবের সালওয়া ডানা মেলে নিঃসীম নীল আকাশে উড়ে বেড়ায় কি না, জানি না, তবে কল্পনার সালওয়া ঠিকই ডানা মেলে। গল্পের সালওয়া অসীম আকাশে চক্কর দেয়! স্থির ডানায়! ঝাপটা ডানায়! আমরা সালওয়ার ডানায় ভর করে পৃথিবীর নানা দিগন্তে (مَنَاكِبِهَا) দৃষ্টি ফেলার চেষ্টা করেছি। দেখার চেষ্টা করেছি, মুসলমানরা কেমন আছে। বিভিন্ন প্রান্তে (أَقْطَارٌ) বাস করা মুসলমানদের সুখ-দুঃখ-হাসিকান্না-ইতিহাস-ঐতিহ্য দেখার চেষ্টা করেছি।

এ ধারার গল্পগুলোতে আমরা কিছু বিষয় তুলে আনার চেষ্টা করেছি। কিছু ভুলে যাওয়া বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। হয়তো স্পষ্ট হয়েছে, হয়তো হয়নি। গল্পগুলোতে থাকা অন্তরালের 'অন্তর' ধরতে না পারলেও সমস্যা নেই। প্রতিটি গল্পই কিছু সত্যকে অবলম্বন করে লতিয়ে উঠেছে। গল্পের প্রয়োজনে কিছু কল্পনার মিশ্রণও ঘটাতে হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পাখিকে ডানা (جَنَاح) দিয়েছেন। আমাদের ডানা দেননি। বলা ভালো, পালকের ডানা দেননি। তবে অন্যরকম একটা ডানা দিয়েছেন। কল্পনার ডানা। এ ডানা পাখির ডানার চেয়ে অনেক গুণ শক্তিশালী! আমরা চাইলে মুহূর্তের মধ্যেই ফুড়ুত করে উড়াল দিয়ে চলে যেতে পারি দূরে! বহুদূরে! দিগন্ত ছাড়িয়ে আরও সুদূরে! পাখির ডানা দিয়ে কদ্দূরই-বা ওড়া যায়!

আমি কল্পনায় যেতে পারি উত্তর মেরুতে। যেতে পারি দক্ষিণ মেরুতে। আন্দালুসে। বায়তুল মুকাদ্দাসে। সিরিয়ায়। ইরাকে। আফগানে। জিনজিয়াঙে। শীশানে। দাবিকে। আ'মাকে। কাশ্মীরে। তাতারিস্তানে। রোমে। মক্কায়। মদীনায়। কল্পনাকে বাস্তবায়ন করার মাঝেই মানুষের আসল কৃতিত্ব! রাব্বে কারীম আমাদের সবাইকে কবুল করে নিন।

সূ চি প ত্র

জীবন জাগার গল্প ৬২৬ : শিক্ষার এ কে-47 / ৯
জীবন জাগার গল্প ৬২৭ : দাদা-নাতনির এতেকাফ! / ১৪
জীবন জাগার গল্প ৬২৮ : সুখের রহস্য / ১৯
জীবন জাগার গল্প ৬২৯ : আধা মিটার / ২১
জীবন জাগার গল্প ৬৩০ : সবর-শোকর / ২২
জীবন জাগার গল্প ৬৩১ : ঘি-ওয়ালী / ২৪
জীবন জাগার গল্প ৬৩২ : আইরিশ নৈতিকতা / ২৬
জীবন জাগার গল্প ৬৩৩ : মা অন্তপ্রাণ / ২৮
জীবন জাগার গল্প ৬৩৪ : চাওয়া-পাওয়া / ৩০
জীবন জাগার গল্প ৬৩৫ : উচিত শাস্তি / ৩১
জীবন জাগার গল্প ৬৩৬ : একদিনের রাজা / ৩৩
জীবন জাগার গল্প ৬৩৭ : বুদ্ধিমান বালক / ৩৬
জীবন জাগার গল্প ৬৩৮ : এ যুগের খাওলা / ৩৯
জীবন জাগার গল্প ৬৩৯ : আল্লাহর সন্তুষ্টি / ৪১
জীবন জাগার গল্প ৬৪০ : মায়ের ভালোবাসা / ৪২
জীবন জাগার গল্প ৬৪১ : দাওয়াতের ময়দানে / ৪৫
জীবন জাগার গল্প ৬৪২ : পান-কাহিনি / ৪৭
জীবন জাগার গল্প ৬৪৩ : বাবার আক্ষেপ / ৫৩
জীবন জাগার গল্প ৬৪৪ : ভুল বোঝাবুঝি / ৫৬
জীবন জাগার গল্প ৬৪৫ : দোয়া ও কামনা / ৬১
জীবন জাগার গল্প ৬৪৬ : পথ-নার্সারি / ৬৩
জীবন জাগার গল্প ৬৪৭ : দয়া ও শাস্তি / ৬৫
জীবন জাগার গল্প ৬৪৮ : সামান্য পার্থক্য / ৬৭
জীবন জাগার গল্প ৬৪৯ : মেকানিক ফোর্ড / ৬৯
জীবন জাগার গল্প ৬৫০ : বুড়োর দুঃস্বপ্ন / ৭০
জীবন জাগার গল্প ৬৫১ : আমার বান্ধবী / ৭২
জীবন জাগার গল্প ৬৫২ : অপেক্ষমাণ জান্নাত / ৭৬

জীবন জাগার গল্প ৬৫৩ : কন্যার দোয়া / ৭৮
জীবন জাগার গল্প ৬৫৪ : অভিব্যক্তির শক্তি / ৮১
জীবন জাগার গল্প ৬৫৫ : দৌড়-প্রতিযোগিতা / ৮৫
জীবন জাগার গল্প ৬৫৬ : অক্ষত লাশ / ৮৭
জীবন জাগার গল্প ৬৫৭ : জ্ঞানের শক্তি / ৮৮
জীবন জাগার গল্প ৬৫৮ : পরকালের চিন্তা / ৯১
জীবন জাগার গল্প ৬৫৯ : কুপুত্র / ৯২
জীবন জাগার গল্প ৬৬০ : হজের মর্মকথা / ৯৫
জীবন জাগার গল্প ৬৬১ : ফ্রি-ল্যান্স পলিটিশিয়ান / ৯৮
জীবন জাগার গল্প ৬৬২ : কালিমাতু হাক্ক / ১০৪
জীবন জাগার গল্প ৬৬৩ : হিজাবী / ১০৬
জীবন জাগার গল্প ৬৬৪ : আমরা ও তারা / ১০৮
জীবন জাগার গল্প ৬৬৫ : পাগলা পানি / ১০৯
জীবন জাগার গল্প ৬৬৬ : সুখী মানুষ / ১১১
জীবন জাগার গল্প ৬৬৭ : সদকা / ১১৩
জীবন জাগার গল্প ৬৬৮ : মাড়াই-ঝাড়াই-বাছাই / ১১৪
জীবন জাগার গল্প ৬৬৯ : পাঁচ টাকার বিলাই / ১১৭
জীবন জাগার গল্প ৬৭০ : কিছু মানুষ এত ভালো কেন / ১১৯
জীবন জাগার গল্প ৬৭১ : নবীওয়ালা আদব / ১২৪
জীবন জাগার গল্প ৬৭২ : ব্যবসা-বুদ্ধি / ১২৬

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প : ৬২৬

শিক্ষার এ কে-47

হানান হারূব। একজন ফিলিস্তিনি শিক্ষিকা। সদ্য বিশ্বের সেরা শিক্ষিকার পুরস্কার পেলেন। লন্ডনভিত্তিক শিক্ষাসংস্থা ভারকে ফাউন্ডেশন এই পুরস্কারের আয়োজন করে। সারা বিশ্বের তালিকাভুক্ত আট হাজার শিক্ষক থেকে দশজনকে বাছাই করা হয়। আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখান থেকে একজনকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

***

আমি চেষ্টা করি প্রতিবার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিগুলোর খোঁজখবর রাখতে। পাশাপাশি বাছাইয়ে টিকে থাকা অন্য নয়জন সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করি। কিছু সৃজনশীল মানুষের চিন্তা বোঝার চেষ্টা করি। কিছু ভালো মানুষের আন্তরিক প্রয়াসগুলোকে। এবার তা হলে ফিলিস্তিনের রামাল্লা থেকে ঘুরে আসা যাক! মনে আছে ওই যে এক মহিলা! যিনি সারাজীবন কুরআনের আয়াত দিয়েই কথাবার্তা চালিয়ে গেছেন! তার শহরে। এবার রামাল্লারই আরেকজন। তার চিন্তাগুলো একটু খতিয়ে দেখা যাক না!

***

আমি যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছি, সেখানে শৈশব বলে কিছু নেই। জন্মের সাথে সাথেই আমরা এক লাফে অনেক দূর চলে যেতাম। চারপাশটা ছিল সহিংসতা-সংঘর্ষে ভরপুর। নিরঙ্কুশ স্থিতিশীল পরিস্থিতি কখনোই ছিল না। আমাদের শিশুদের বেড়ে ওঠা, বিশ্বের আর দশটা দেশের চেয়ে ভিন্ন। তাই তাদের শিক্ষাব্যবস্থাও ভিন্ন ধাঁচে না হলে কার্যকর হবে না। সে চিন্তা থেকেই আমি ভিন্ন একটা কিছু করা নিয়ে ভাবছিলাম।

***

আমার স্বামী-সন্তান বাড়ি ফেরার পথে গুলিতে আহত হয়েছিল। এই ঘটনায় বাড়ির সবাই মুষড়ে পড়ল। সন্তানদের চিন্তা অন্যখানে বইতে শুরু করল। তাদের আচরণ, ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিল। আমার উৎকণ্ঠার কথা অন্য শিক্ষকদের বললাম। কেউ তেমন গুরুত্ব

দিল না। ভাবতে শুরু করলাম, কীভাবে আমাদের শিশুদের এই পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব থেকে বের করে আনা যায়।

***

প্রথমেই একটা কাজ করলাম, আমার সন্তানদের প্রতিবেশীর সন্তানদের সাথে খেলার সুযোগ করে দিলাম। একসাথে ওঠাবসা করতে দিলাম। এতে ফল হলো, তারা ইসরায়েলি হামলার খারাপ প্রভাব কাটিয়ে কিছুটা সামাজিক হতে শুরু করল। আত্মকেন্দ্রিক অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করল। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে লাগল। ঘরের বাইরে বের হওয়ার ভীতি কেটে গেল।

মাথায় এল, এভাবে কাজটা যদি আরও বড় পরিসরে করি, অন্য শিশুদের মধ্যেও হয়তো ভালো একটা প্রভাব পড়বে। এই চিন্তা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে শিশুদের স্কুলে যোগ দিলাম। প্রথম দিন থেকেই আমি একটা কথা ঠিক করে নিয়েছিলাম—আমি শিশুদের সাথে অত্যন্ত সামাজিক ও আপনজনসুলভ হব। আমি তাদের বাবা-মা-শিক্ষক-দিকনির্দেশক-বন্ধু সবকিছু হব। তারা শুধু স্কুলের গণ্ডিতেই নয়, চার দেয়ালের বাইরেও তারা আমার ছাত্র থাকবে। স্কুলের বাইরের কু-প্রভাব থেকে বাঁচানোর দায়িত্বও আমার। না হলে শিক্ষাটা পরিপূর্ণ হবে না। আধাআধি থেকে যাবে। চার ঘণ্টার শিক্ষা দিয়ে বিশ ঘণ্টার প্রভাবকে ঠেলে দূর করতে পারব না।

***

পরিবেশ-পরিস্থিতিই আমদের সহিংস হওয়ার পথে ঠেলে দেয়। সহিংসতাটা শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও হয়। আমাদের ছেলেরা শুধু হাতেই পাথর ছোড়ে না, মনেও ছোড়ে। এই মানসিকতা তাদের শিক্ষা থেকে ছিটকে ফেলছে। আমি এর প্রতিকার খুঁজছিলাম। মনে হয় কিছুটা পেয়েও গেছি।

আমাদের ছেলেরা শুধু যে রাজপথের সহিংসতা দেখেই থেমে যাচ্ছে তা নয়, এসবের ভিডিও মোবাইলে, টিভিতে দেখে দেখে চব্বিশ ঘণ্টাই একটা লাইভ সহিংসতার ঘোরের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। তাদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা গড়ে ওঠারই সুযোগ পায় না। এ জন্য আমাদের স্কুলগুলোর শিক্ষাদীক্ষাও তাদের উপযোগী করে গড়ে তোলা অতীব প্রয়োজন ছিল। এদিকটা নিয়েই আমি সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছিলাম। তবে আমাদের ছেলেদের

কিছু গুণ আছে; তারা নির্ভীক। ভয়-ডর-শঙ্কাহীন। কষ্টসহিষ্ণু। কর্মঠ। সংগ্রামী। ভেবে দেখলাম, তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগালে, অনেক দূর নিয়ে যাওয়া যাবে। সেটাই করে যাচ্ছি।

***

আমি চাই স্কুলে এসে যেন একটা ছেলে বা মেয়ে অস্বস্তি বোধ না করে। সে যেন ভাবতে পারে, স্কুলটাই তার ঘর। বা তার চেয়েও বেশি কিছু। মায়ের আদর, বাবার স্নেহ, বোনের মমতা, ভাইয়ের আশ্রয় স্কুলেও পায়। তার মনের একটা আকাঙ্ক্ষাও যেন অচরিতার্থ না থাকে। চিৎকার-হইচই-চেঁচামেচি সবই যেন করতে পারে। ফাঁকে ফাঁকে চলবে পড়াশোনা।

চেষ্টা করি, একটা শিশুর সাথে আমার সম্পর্কটা এমন হয়, কোনো কথা সে মায়ের কাছে বলতে না পারলেও আমার কাছে যেন অসংকোচে বলতে পারে। অকপটে মুখ খুলতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি অনেকটাই সফল।

শিশুরা স্কুলে এসেই দৌড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমিও সাগ্রহে তাদের দিকে দৌড়ে যাই। গল্প জুড়ে দেয়। আমার কাছে মায়ের নামে নালিশ করে। বড় ভাইয়ের নামে একগাদা অভিযোগ করে। গাল ফোলায়। আমাকে সেটার বিচারও করতে হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে। আমার এসব করতে ভীষণ ভালো লাগে।

ক্লাসরুমটা যেন জেলখানা না হয়ে পড়ে। সেটা যেন শিশুর খেলার বাগানের মতো হয়। আমাদের কাছে উন্নত বিশ্বের মতো যান্ত্রিক উপকরণ নেই, কিন্তু মানবিক উপকরণ আছে। তারা যেটা করে মেশিন দিয়ে, আমরা সেটা শরীর দিয়ে করতে পারি। মেশিনের চেয়ে মন অনেক বেশি মানবিক আর হৃদয়গ্রাহী। মনকাড়া।

***

আমি প্রথম হয়েছি, এসব কোনো আদর্শ শিক্ষকের কামনা-বাসনা হতে পারে না। এটা নিছক একটা বস্তুগত উপকরণ। হয়তো খ্যাতিলাভটা আমার কর্মক্ষেত্রের জন্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যদি আমি সেটাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারি। না হলে সেরা হওয়ার নেশায় ডুবে টিভি-রেডিওতে সাক্ষাৎকার দিয়ে বেড়ালাম, সংবর্ধনা গ্রহণ করতে শুরু করলাম, এদিকে আমার সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল। তা হলে এত মেহনতের আর কী অর্থ রইল!

শিক্ষকরাই বিশ্বের প্রকৃত শক্তি। তারাই পারেন বিশ্বকে বদলে দিতে। অল্প ব্যয়েই। স্বল্প মেহনতেই। আমি তা-ই করার চেষ্টা করছি।

***

নিজদেশেও আমি এবং আমরা পরবাসীর মতো জীবন কাটাচ্ছি। অসংখ্য মুখাইয়াম (শিবিরে) ছিলাম। সব জায়গা থেকে আমি একটা না-একটা গুণ অর্জন করেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষাটা আমি লাভ করেছি তা হলো, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা ও অনড়ভাবে লেগে থাকা।

আমি শিক্ষকতা করতে গিয়ে খেয়াল রাখি তাকামুল বা পরিপূর্ণতার দিকে। শিক্ষা ও দীক্ষা। চিন্তা ও মূল্যবোধ। আখলাক ও আচরণ। শুধু পুথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের পাঠও যেন সাথে সাথে দিয়ে দিতে পারি।

***

একদিন কুদস ইউনিভার্সিটি থেকে ঘরে ফিরছি। ইসরায়েলি সৈন্যরা একজন লোককে মেরে ফেলে রেখেছে। ছোট্ট ছেলেটাও বাবার সাথে ছিল। সৈন্যটা এবার রাইফেল তাক করেছে শিশুটার দিকে। অবাক কাণ্ড হলো, শিশুটা একটুও ভয় না পেয়ে, হাসি মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যুগপৎ আনন্দ আর কষ্ট পেলাম। একটা শিশু তার বাবার মৃত্যুতে কাঁদবে না? আবার এ ভেবে আনন্দ পেলাম, আমাদের শিশুরা অস্ত্রের মুখেও বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে।

***

শিশুদের শিক্ষা দেয়ার তিনটি পদ্ধতি আমার কাছে বেশ ফলদায়ক মনে হয়েছে।

ক. খেলতে দেয়া।
খ. পুরস্কার দেয়া।
গ. প্রশংসা করা।

আমাদের স্কুলের স্লোগানই হলো, আমরা খেলতে খেলতে শিখি। নাল'আব নাতা'আল্লাম। উই প্লে অ্যান্ড লার্ন। এ বিষয়ে একটা বইও লিখেছি : *নাল'আব নাতা'আল্লাম*।

পুরস্কার যে বড় কিছু হতে হবে এমন না। আশেপাশে চোখ রাখলেই পুরস্কার তৈরি করে ফেলা যায়। পানির বোতল কেটে ফুল বানানো যায়। সেটাই হতে পারে পুরস্কার। শিশুদের দিয়েও তাদের পুরস্কার বানিয়ে নেয়া

যায়। তাদের বুদ্ধিমত্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে। নিজের প্রাপ্ত পুরস্কার অন্যকে বা ফান্ডে দান করে দেয়ার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করা যায়।

***

একজন শিক্ষকের বড় সঞ্চয় তার ছাত্ররা। ব্যাংক-ব্যালেন্স নয়। ছাত্রদের নিয়েই তার জগৎ গড়ে উঠবে। সংসার গড়ে উঠবে। পুরস্কারে পাওয়া ১ মিলিয়ন ডলারের পুরোটাই গরীব ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচের পেছনে ব্যয় করার ইচ্ছা আছে।

***

আমি শিক্ষকদের বলি, প্রত্যেকেরই কিছু না-কিছু আইডিয়া আছে। আমরা সেটাকে মডিফাই করে কাজে লাগাতে পারি। আমার আইডিয়াই কাজে লাগাতে হবে এমন নয়। তবে নিজের আইডিয়াকে অন্যের সাথে শেয়ার করতে হবে। আলোচনা করতে হবে। উন্নত করে তুলতে হবে। প্রচার করতে হবে। নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের প্রতি খেয়াল ও আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে।

পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে, পুরস্কার পেয়েছি বলেই আমি সেরা হয়ে গেছি, এমনটা নয়। আলোচনার পাদপ্রদীপের বাইরে আরও কত শিক্ষক রয়ে গেছেন। তাদের কাছে আমাদের শ্রম হয়তো কিছুই নয়।

***

এক অভিভাবকের অভিব্যক্তি :

আমার ছেলে কারাম কাউকেই পছন্দ করত না। সঙ্গী-সাথিদেরও না। তার কোনো খেলার সাথি ছিল না। স্কুলে যেতে তার মোটেও ভালো লাগত না। বয়েস কম হলে কী হবে, সে ছিল অত্যন্ত হিংস্র আর হিংসুটে প্রকৃতির। একজনের পরামর্শে ছেলেকে নিতান্ত অনাগ্রহের সাথে হানানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে ছেলে আমার অন্য ছেলেতে রূপান্তরিত হলো। তার এখন অনেক বন্ধু। সে সুর তুলতে পারে। আঁকতে পারে। অক্ষর চেনে। লিখতে পারে। হানানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। হানান আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নবজীবনের প্রেরণা জুগিয়েছেন। নতুন করে হাসতে শিখিয়েছেন।

***

কোনো পরিবারে হামলা হলেই আমি ছুটে যাই। শিশুটাকে কোলে তুলে নিই। চেষ্টা করি তাকে এই নারকীয় পরিবেশের ছোঁয়া থেকে দূরে সরিয়ে আনতে। আমাদের খেলার স্কুলে নিয়ে আসতে।

আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। খেলার মাঠগুলোতে যাই। পাড়ার অন্ধকার গলিগুলোতে টহল দিই। খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করি, কোথায় আমার শিশুরা লেখাপড়া বাদ দিয়ে অন্যকিছুর তালিম নিচ্ছে। ঢিল ছোড়া শিখছে। গুলতি নিয়ে অহেতুক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরে স্কুলে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। বোঝাই—এসব বড় হয়ে কোরো। এখন মন দিয়ে পড়ো। কেউ সাথে সাথে চলে আসে। কেউ-বা ছুটে পালিয়ে যায়। আমি পালাই না। ঠিক চিনে রাখি, আবার যাই। আবার যাই। আবার যাই। আমাকে যেতেই হয়।

***

আমার কাছে ইসরায়েলের মোকাবেলায় অস্ত্র নেই। শক্তি নেই। আছে শিশুরা। তাদের গড়ে তুলতে চাই। ইসরায়েলিদের এ কে-47 এর বিপরীতে আমার ছেলেরাই হবে শিক্ষাদীক্ষায় ভিন্ন এক এ কে-47। ইনশা আল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৬২৭

দাদা-নাতনির এতেকাফ!

আমরা মসজিদের যে পাশটাতে তাফসীর পড়তে বসি, তার বিপরীত পাশে এতেকাফে বসেছেন একজন ক্বারী সাহেব। আত্মস্বীকৃত ক্বারী। আত্মপ্রচারিত ক্বারী। তিনি আসলে ক্বারী নন, তাদের বাড়ির নাম 'ক্বারী বাড়ি'। হয়তো তার পূর্বপুরুষদের কেউ কখনো ক্বারী ছিল। সে সূত্র ধরেই বাড়ির সবাই এখন ক্বারী। তার ক্বারিয়ানার পরিচয় দিতে আজ বসিনি। বসেছি তার এতেকাফের পরিচয় দিতে। জীবনে অনেক ধরনের এতেকাফ দেখেছি। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন তরীকার এক এতেকাফ দেখার তাওফীক হলো।

***

টিনটিনের একটা কার্টুন পড়েছিলাম। *আনন্দমেলায়*। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ছোটদের পত্রিকা। ঘটনাটা ছিল কুয়েতের একজন শায়খকে নিয়ে। বুড়ো শায়খ নাতিকে হারিয়ে দিশেহারা। নাতির নানা দুষ্টুমির কথা স্মরণ করে কাঁদছে। টিনটিনরা গিয়ে নাতিকে উদ্ধার করে দিয়েছে। আমাদের এ ক্বারীকে দেখে সে বুড়োর কথা মনে পড়ে গেল।

***

বুড়ো ক্বারী রমযানের প্রথম দিন থেকেই এতেকাফে আছেন। পুরো মাস থাকবেন। খুবই কঠিন এক সিদ্ধান্ত। গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ হয়েও এমন শিখরস্পর্শী আমল করার হিম্মত সবাই করতে পারে না।

বুড়ো সারাদিন তেমন নজরে পড়েনি। ভেবেছি, এমনিতেই মসজিদে আছেন। আরও অনেকেই তো কুরআন তিলাওয়াত করছে। বুড়োকে আলাদা করে দেখলাম ইফতারির সময়। সবাই ইফতারি করছে, বুড়ো পুরো দস্তরখানায় ঘুরে ঘুরে কলার খোসা কুড়োচ্ছে। সবার কৌতূহলী দৃষ্টি বুড়োর ওপর নিবদ্ধ। বুড়ো একটা পলিথিনের ব্যাগে খোসাগুলো সযত্নে রেখে দিল।

***

বুড়োকে দেখি দিনের বেশির ভাগ সময়ই কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। শুধু শুয়ে নন, রীতিমতো নাকডাকা ঘুম। কিছুক্ষণ পর পর জেগে ওঠেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বিশাল একটা তসবি দিয়ে কী যেন পড়তে শুরু করেন। একবার পড়া হলেই, একটা বড় রশিতে গিঁট দেন। মনে হয় কোনো খতম ধরেছেন! গিঁট দেয়া নিয়েও আবার নানা ফ্যাচাং। কিছুক্ষণ পড়ার পর, কুঁউউউ আওয়াজ করে, বিড়ালের মতো আস্ত জিব বের করে লম্বা-া-া একটা হাই তোলেন। তারপর আবার চিত্তির!

***

বুড়োর ঘুম ভাঙারও একটা সময় আছে। ঠিক যেন কামারের বেড়াল। বেড়ালটা সারাদিন কামারের দোকানে ঘুমিয়ে থাকে। হাপরের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ, নেহাইয়ের ঠুং-ঠাং বিকট শব্দেও তার ঘুম ভাঙে না। কিন্তু কামার যেই ভাত খেতে বসে, মাছের কাঁটা চোষার মৃদুতম ফিসসস শব্দ করেছে, তাতেই তিনি ম্যাঁয়াও শব্দ করে জেগে বসে যান। আমাদের ক্বারী সাহেবও এতক্ষণ দেখলাম, বিকটস্বরে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন, যেই বুড়োর নাতনি মসজিদের সামনে দিয়ে মক্তবে পড়তে যাচ্ছে, কোথায় ঘুম, কোথায় কী? তড়াক করে লাফিয়ে মসজিদের দরজায়। সাথে সাথে কোমল মিহি স্বরে ডাক,

–ও খোদেজা, এক্কানা হুনি যা! (একটু শুনে যা)।

দাদা মিঞা নাতনির হাত ধরে, মসজিদে এনে বসান। দুজন মিলে কত কথা যে হয়! এর কথা জিজ্ঞেস করেন, ওর খবর জিজ্ঞেস করেন। প্রশ্নের

বছর শেষই হতে চায় না। ঠিক একই প্রশ্ন ভোর রাতে ভাত নিয়ে আসা বড় ছেলেকেও করে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। আরে বাপু! এতই যখন দুনিয়ার ধান্দা, এতেকাফে বসতে কে বলল?

কথাবার্তা শেষ করে, নাতনির হাত ধরে নুরানিখানায় পৌঁছে দিয়ে আসেন। আমরা বলি :
-দাদা, এতেকাফে বসলে তো প্রয়োজন ছাড়া, মসজিদের বাইরে যাওয়া যায় না!
-আরে, আমি মসজিদের বাইরে কোথায় গেলাম?
-এই যে নুরানিখানায় গেলেন?
-আরে হিয়ানে তো মাদাসাত গেসি! মসোইদ আর মাদাসা এক জিনিস! এক্কান আল্লার ঘর, আরেক্কান নবীসার ঘর! (আরে সেখানে তো মাদরাসায় গিয়েছি! মসজিদ আর মাদরাসা তো এক জিনিস। একটা আল্লাহর ঘর, আরেকটা নবীজির ঘর)।

নাতনিকে মক্তবে দিয়ে এসে, আরেক বার তসবি নিয়ে বসেন। এক বার পড়েই, সেই বিড়াল-হাই তুলে কাঁথামুড়ি। ঠিক বারোটার সময় কোনো উপসর্গ ছাড়াই তড়াক করে উঠেই দরজার দিকে ছোটেন। কীভাবে যে উনি জেগে যান সে এক রহস্য! বারোটার দিকে নাতনির মক্তব ছুটি হয়। আবার কিছুক্ষণ চলে দাদা-নাতনির প্রেস কনফারেন্স। কত রকমের কথা যে বলে দুজনে, ইয়ত্তা নেই!

***

একদিন সকালে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ হইচই শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কী হলো! কী হলো! দেখি বাইরে তুমুল বৃষ্টি। বুড়ো ক্বারী চিৎকার করে বাইরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে,
-ওরে কই মাছ উজার রে, কই মাছ উজার!
আমরাও দৌড়ে গেলাম পিছু পিছু। মাদরাসার পুকুর থেকে বৃষ্টির পানিতে কই মাছ উঠে আসছে। বুড়ো লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে মাছ শিকারে নেমে পড়ল। আহারে এতেকাফ!!!!

পরদিন আরেক কাণ্ড! দুপুরের দিকে দেখি নাতনি একটা বড়শি নিয়ে হাজির। বড়শি দিয়ে কী হবে? ক্বারী সাহেব সাথে সাথে উত্তর দিলেন :

–বিয়াইল্লা হুদা হুদা বই থাই কিউরমু, দুগা-ইগ্‌গা মাছ হাইলেও মন্দ কী! (বিকেলে এমনি এমনি বসে থেকে কী করব, দুয়েকটা মাছ পেলে মন্দ হয় না!)। আহারে এতেকাফ!!!

***

তারাবী পড়ার পর, বুড়োর ভাত নিয়ে এল একজন। তাকে বলে দিল,
-কাইল্যা এক্কানা মিয়াঁরে লই আইস। (আগামীকাল মিয়াঁকে নিয়ে আসবি।)

আমরা ভেবেছি, মিয়াঁ কোনো নাতির নাম হবে হয়তো। পরদিন মিয়াঁ দেখে তো আমাদের আক্কেলগুড়ুম! মিয়াঁ হলো নাদুস-নুদুস নধর একটা ছাগল। ছাগল নিয়ে আসার পর, বুড়োর সে কী আদর! আগের দিন জমিয়ে রাখা কলার খোসাগুলো একটা একটা করে খাওয়াচ্ছে। এখানেই শেষ নয়, ছাগলটাকে নিয়ে নলকূপের কাছে গেল। ভালো করে দলাই-মলাই করে সেটাকে গোসল করিয়ে দিল।

***

একদিন দেখি আরও আজব কাণ্ড! বুড়ো এক হাতে নাতনি, আরেক হাতে 'ছাগল মিয়াঁ'কে ধরে দোকানে গেল। কৌতূহলী হয়ে চোখ রাখলাম। দোকান থেকে দুটো সাগর কলা কিনল। একটা নাতনিকে দিল আরেকটা টুকরো-টুকরো করে 'মিয়াঁ'কে খাওয়াল। আহা, এমন এতেকাফ না দেখলে জীবনটাই বৃথা হয়ে যেত!!!

***

বুড়ো ক্বারীর একটা আচরণ আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে। আমরা কয়েকজন মাঝেমধ্যে, ফজরের পর ইশরাক পড়ার পর কামরায় আসতাম না। বাইরে বৃষ্টি থাকলে বা ঘুমের প্রকোপ বেশি হলে, মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়তাম। মাঝেমধ্যে তারাবীর পরেও সামান্য কাত হতে গিয়ে এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে।

একদিন গভীর রাতে কিছু একটার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলাম, বুড়ো টর্চলাইট হাতে এদিকে আসছে। সন্দেহ হলো। মটকা মেরে গুটিসুটি হয়ে ঘুমের ভান করলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। বুড়ো এক-এক করে জানালার শার্সিগুলো টেনে দিলেন। তারপর আমাদের ঘিরে

বারকয়েক চক্কর দিলেন। কাঁধ থেকে গামছা নামিয়ে আমাদের পায়ের দিকটাতে লম্বা সময় ধরে বাতাস করলেন। মাথার কাছে এসেও করলেন। আমাদের এতক্ষণ মশা ছেঁকে ধরেছিল। বুড়ো ক্বারীর রাতজাগা মহত্ত্বে আপাতত নিস্তার মিলল।

***

আরেক দিন সকালে ঘুমিয়ে আছি। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘের মতো আমাদের মসজিদে রাতে মশা, দিনে মাছি-পিঁপড়া। ঘুম ভাঙার পর দেখি, বুড়ো ক্বারী সাহেব, গামছা হেলিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। আর পিঁপড়ার সারিকে অন্য দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। পিঁপড়াগুলো তাড়ানো যাচ্ছে না দেখে, উঠে চিনি নিয়ে এলেন। আমাদের অদূরে কিছুটা চিনি ছিটিয়ে দিলেন। ব্যস, পিঁপড়াগুলো অন্য দিকে সরে গেল। আমরাও পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারলাম।

***

বুড়োর গুণের এখানেই শেষ নয়, নাতনি-মিয়াঁ-ঘুম ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে তার আরেকটা কাজ আমাদের সবাইকে অবাক করেছে। এমনকি হুযুরও মাঝেমধ্যে দরস বন্ধ করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। বুড়ো একটু সুযোগ পেলেই, ঝাড়ু হাতে নেমে পড়েন। একবার মসজিদের বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছেন। আরেক বার গামছা দিয়ে জানালার কাচগুলো মুছে ঝকঝকে করে তুলছেন। আবার লম্বা হাতলঅলা বুরুশ নিয়ে সিলিং ফ্যানের ডানা পরিষ্কার করছেন।

***

আমার ভাবনায় এল,

এক. নিয়ম মানা দিয়ে সবাইকে বিবেচনা করা ঠিক নয়।

দুই. কারও মধ্যে একদিকের দুর্বলতা দেখেই মন্তব্য করে বসা বোকামি।

তিন. শিক্ষিত মানেই মহৎ নয় আবার অশিক্ষিত মানেই অবজ্ঞেয় নয়।

বার বার এ প্রশ্নটাই ঘুরপাক খায় :

-মানুষের মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর অভ্যেস কোত্থেকে আসে? আমি কেন অন্যদের মতো এতটা সুন্দর মনের মানুষ নই?

জীবন জাগার গল্প : ৬২৮

সুখের রহস্য

রাজার অবাক লাগে। একজন সামান্য বেতনের খাদেম। কিন্তু কী সুখী সুখী হয়ে থাকে। সারাদিন রাজপ্রাসাদে কাজ করে হাসিমুখে বাড়ি ফেরে।
–উজির, বলতে পার রহস্যটা কোথায়? আমি তো খোঁজ নিয়েছি। তার ঘরবাড়ি ভাঙাচোরা। মাসোহারা যা পায়, কোনোরকমে দিন চলে যায়।
–হুজুর, আমার কাছে রহস্য জানার একটা উপায় আছে।
-বলো দেখি তোমার কৌশল। আমার জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে।
-ওটার নাম ৯৯-এর কৌশল। কৌশল না বলে ফাঁদ বলাই ভালো। একটা কাজ করতে হবে। আমরা রাতের বেলা একটা থলেতে ৯৯টি দিরহাম ভর্তি করে, সেটা খাদেমের ঘরের সামনে রেখে আসব।
-তারপর?
-ও হ্যাঁ, থলের ওপরে লিখতে হবে, এক শ দিরহাম! তারপর আমরা দরজায় টোকা দিয়ে সরে পড়ব।

***

তা-ই করা হলো। গভীর রাতে দরজায় টোকা পড়ায় খাদেম ভয় পেয়ে গেল। তবুও কৌতূহলের কাছে ভয় হার মানল। দরজা খুলে বের হলো। সামনে পড়ল থলেটা। তাড়াতাড়ি হাতে নিয়ে দেখল এক শ দিরহাম লেখা। দ্রুত এদিক-সেদিক তাকিয়ে দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘরের এক কোণে গিয়ে দিনার গুনতে বসে গেল। কয়েক বার গোনার পরও দেখা গেল একটা দিনার কম হচ্ছে। সবাইকে ডেকে তুলে দিল। হারানো এক দিরহাম খোঁজায় লাগিয়ে দিল। সবাই আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে। বাড়ির চারপাশ খোঁজা শেষ হলো। রাস্তায় গিয়েও খুঁজে আসা হলো। না, কোথাও পাওয়া গেল না।

খাদেম রেগে গেল। কোথায় যে গেল এক দিরহাম। এক দিরহামের চিন্তায় বাকি রাত ঘুম এল না। নির্ঘুম রাত কেটে গেল। চোখের নিচে দাগ পড়ে গেল। ঘুম ঘুম চোখ আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে দরবারের কাজে গেল। রাজা বেজায় আগ্রহ নিয়ে খাদেমের মুখাবয়ব লক্ষ করছিলেন। কেমন অসুখী চেহারা। বেজার বেজার মুখ।
-উজির, এটা কী করে হলো?

-খাদেম লোকটা যা বেতন পেত, সেটা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। বাড়তি কোনো আশা করত না। লোভও করত না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত টাকা যোগ হতেই তার ভেতরে লোভ জেগে উঠল। তার এতদিনকার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল।

-তাই বলে একটা দিরহামের জন্যে এমন মুষড়ে পড়বে?

-ওই যে বললাম হুজুর, লোভ! লোভের ধরনই এমন। আপনার কাছে ৯৯ টাকা থাকলেও, বাকি এক টাকার জন্যে হাপিত্যেশ করে বেড়াতে হবে।

***

আল্লাহর নেয়ামতগুলোও এমন। আমাদের তিনি ৯৯টা নেয়ামত দিয়েছেন। সামান্য একটা নেয়ামত হয়তো দেননি। না দেয়ার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। আমরা কারণটা না বুঝেই ৯৯টা নেয়ামত ভুলে বাকি এক নেয়ামতের জন্যে সারাক্ষণ হা-হুতাশ করে বেড়াই। অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করে দেখি হরদম।

***

এটা হয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যার কারণে। আল্লাহ আমাকে একটা নেয়ামত দেননি। পাশের ঘরের মানুষটাকে দিয়েছেন। আমি ধরে নিই, আল্লাহ আমার প্রতি অবিচার করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। আমার মাথায় ঘুণাক্ষরেও চিন্তা আসে না, আমাকে যে প্রতিবেশী লোকটার মতো 'এক শ তম' নেয়ামত দেয়া হলো না, সেটাও একটা নেয়ামত। কীভাবে? নেয়ামত না দেয়াটা নেয়ামত হয় কী করে?

উত্তরটা কয়েকভাবে দেয়া যায় :

ক. হয়তো নেয়ামতটা পেলে, আমি সেটার যথাযথ কদর করতে পারতাম না। না-শোকরি করতাম। অবহেলা করতাম। বড় গুনাহ হয়ে যেত। এখন নেয়ামতটা না থাকাতে গুনাহ থেকে বেঁচে গেলাম। এটা কি একটা নেয়ামত নয়?

খ. আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি দয়া করে নেয়ামতটা দুনিয়াতে না দিয়ে হয়তো আখেরাতে দেবেন। এটাও তো একটা নেয়ামত!

গ. আমি আদৌ এই নেয়ামতের যোগ্যই নই। আমার কোনো ঘাটতির কারণে আমাকে নেয়ামতটা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

ঘ. আমার ওপর কোনো বিপদ আসার ছিল। নেয়ামত না দিয়ে আল্লাহ তার বিনিময়ে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অথবা ভবিষ্যতে কোনো বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেবেন

জীবন জাগার গল্প : ৬২৯

আধা মিটার

গত শতকের ল্যাটিন আমেরিকার এক দেশের ঘটনা। তখন চারদিকে স্বর্ণানুসন্ধানের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। নির্দিষ্ট কিছু এলাকা রীতিমতো 'স্বর্ণাঞ্চল' হিশেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। একলোক স্বর্ণের লোভে এমনই এক স্বর্ণাঞ্চলে পাড়ি জমাল। যাচাই-বাছাই করে মালিককে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পাহাড়সংলগ্ন একটা জমি কিনে নিল। কয়েক দিন যাওয়ার পর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করল। সপ্তাহখানেক খোঁড়ার পর কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণের আভাস দেখা দিল। দ্বিগুণ উৎসাহে মাটি খনন চালাতে লাগল। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর স্বর্ণের পুরু আস্তর বের হলো। এবার সংগ্রহের পালা। এরই মধ্যে লোকটা নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছে। একা একা এত আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আবার নিরাপত্তার ব্যাপার-স্যাপারও আছে। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে ওখানে যা সম্পদ ছিল সব বিক্রি করে একটা গাড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জামও কিনে আনাল।

***

সবাই হাত লাগানোর ফলে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হয়ে গেল। বাড়তি স্বর্ণের আশায় আরও কিছুদূর গর্ত খুঁড়ে দেখল। নাহ, আর স্বর্ণরেণু দেখা যাচ্ছে না। এখানে আর স্বর্ণ নেই। এবার ফেরার পালা। কিন্তু এই জমিটা কী করবে? দরদাম করে আরেকজন স্বর্ণসন্ধানীর কাছে বিক্রি করে দিল। নামমাত্র মূল্যে। লোকটা অবাক! এমন জমিও কেউ কেনে? এখানে স্বর্ণ যা ছিল, সব তো সে-ই উঠিয়ে নিয়েছে!

***

নতুন মালিক অন্যের টিটকারি গায়ে মাখল না। তার হারাবার কিছু নেই। স্বর্ণ পাওয়া না যাক, জমিটা তো আছে! চুপচাপ খননের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। সব কাজ শেষ হলো। কিছু মাটি সংগ্রহ করে একটা পলিথিনের ব্যাগে নিল। শহরের ইউনিভার্সিটিতে গেল। সেখানকার একজন মৃত্তিকাবিজ্ঞানীর সাথে দেখা করল। আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথেও কথা বলল। সবাই মাটি দেখে জানাল,
–এই মাটির খুব নিকটেই স্বর্ণ থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা!

লোকটা পরম আনন্দে ফিরে এল। এখন খনন শুরু করতে কোনো বাধা নেই। সুনিশ্চিত আশা পাওয়া গেছে। আগের গর্ত যেখানে শেষ হয়েছিল,

তার পর থেকেই খনন শুরু হলো। অবাক কাণ্ড! মাত্র আধা মিটার মাটি সরানোর পরই স্বর্ণরেণু বের হতে শুরু করল। আস্তে আস্তে স্বর্ণের বিপুল মজুত দেখা দিল। চারদিকে রটে গেল। সবাই দেখতে আসছে। স্বর্ণের এমন মজুত তো সচরাচর দেখা যায় না। খবর পেয়ে আগের মালিকও দেখতে এল।

***

প্রথম মালিক এসে সবকিছু দেখার পর তো তার চোখ ছানাবড়া! অবিশ্বাস্য! মাত্র আধা মিটার দূরেই এত এত স্বর্ণ মজুত ছিল, আর আমি তীরে এসে তরি ডুবিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেলাম! তার মুখের অবস্থা দেখে দ্বিতীয় মালিক প্রশ্ন করল,

-তুমি কি অনুতাপ বোধ করছ?

-না না!

-তা হলে এখানে কেন এসেছ?

-আমি আসার আগেই সব কথা জেনেছিলাম! তারপরও এসেছি ভিন্ন এক কারণে!

-কী কারণ?

-আমি কিছু শিক্ষাকে ভালো করে রপ্ত করার জন্যে এখানে এসেছি!

ক. বাকি জীবন মনে রাখব, আমি অগাধ সম্পদ হাতে পেয়েও মাত্র আধা মিটারের জন্যে হারিয়েছি।

খ. আমি আমার চলার পথে প্রথম বাধাতেই থমকে গিয়েছি। বাধা ডিঙিয়ে আর আগে বাড়তে চাইনি।

গ. আমি নিজে নিজেই কাবিল সাজতে গিয়েছি। নিজেকেই অভিজ্ঞ আর স্বয়ংসম্পূর্ণ ভেবেছি। আপনার মতো অভিজ্ঞ কারও সাথে পরামর্শ করিনি!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩০

সবর-শোকর

এক লোককে বন্দী করা হলো। কোনো অপরাধ ছাড়াই। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও রাজার পক্ষ থেকে মুক্তির কোনো আভাস মিলল না। প্রধান উজিরকে দিয়ে সুপারিশ করেও কোনো কাজ হলো না। কেউ রাজার কান ভাঙানি দিয়েছে, বন্দী লোকটা ভয়ংকর বিদ্রোহী। তাকে ছাড়লে বিপদ হতে পারে!

এদিকে লোকটার অবস্থা শোচনীয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ল। বিনা অপরাধে বন্দী থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে তার পরিবার একটা চিঠি লিখল। কারাগারের প্রহরীর সাথে হাত করে, চিঠিটা প্রাপকের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হলো। চিঠিটা লিখেছেন তার দাদা। নাতিকে বলছেন,

-ভাই, সবর করো। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।

***

চিঠি পাওয়ার ক'দিন পর, রাজার হুকুমে বন্দীকে দোররা মারার ব্যবস্থা করা হলো। বাড়ি থেকে আবার প্রবোধমূলক চিঠি এল,

-তুমি ধার্মিক মানুষ! সবর করো! আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ো না।

***

ক'দিন পর আরও কঠিন সাজা এল। হুকুম হলো পায়ে বেড়ি পরাতে হবে। কারাগারের নিয়ম হলো, একসাথে দুজনকে বেড়ি পরাতে হবে। এই ধার্মিক বন্দীর সাথে যাকে বাঁধা হলো, ঘটনাক্রমে সে ছিল একজন মজুসি। অগ্নিপূজারি। বন্দীর অবস্থা আরও সঙিন! আগেই ভালো ছিল! এখন তো পরিস্থিতি সহ্যসীমার বাইরে চলে গেল!

***

মজুসি বন্দী কারাগারের খাবার খেতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সারাক্ষণ শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে হয়। বাধ্য হয়ে সহবন্দীকেও বসে থাকতে হয়। আগে একটু হাঁটাচলা করা যেত, এখন তাও বন্ধ। একদিন পর মজুসীর পেটে অসুখ হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ পর পরই 'প্রকৃতির' ডাকে সাড়া দিতে ছুটছে। বাধ্য হয়ে অন্য জনকেও ছুটতে হয়। ধার্মিক মানুষটার ধর্ম যায় যায় অবস্থা! গুরুতর অবস্থা বিবেচনা করে, দাদা এবার নিজেই সরাসরি দেখা করতে এল। বলেকয়ে নাতির সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করে নিল।

-বাছা, ধৈর্য ধরো! আল্লাহর প্রতি রাজিখুশি থাকো। তাঁর ফায়সালার প্রতি কোনোরকমের অসন্তুষ্টি প্রকাশ কোরো না। তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো।

-ধৈর্য ধরব? আর নেয়ামতের কথা স্মরণ করব? কোন নেয়ামত? এই চরম দুরবস্থার মাঝে আপনি নেয়ামত কোথায় দেখছেন?

-নাতি, তুমি যার সাথে বন্দী হয়ে আছ, সে কোন ধর্মের?

-মজুসি ধর্মের।

-আল্লাহ তোমাকে ঈমানের দৌলত নসীব করেছেন। কল্পনা করে দেখো তো, তুমিও যদি তার মতো মজুসি হতে, আগুনের পূজা করতে, আখেরাতে তোমার স্থান কোথায় হতো? আল্লাহ তোমাকে যে ঈমানের দৌলত দিয়েছেন, সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করো! সবর করো!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩১

ঘি-ওয়ালী

বাজার জমে উঠেছে। গ্রামের লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে আনাজপাতি নিয়ে এসেছে। এখানের মানুষজন গরু-পালনে বেশ দক্ষ। বাজারটাও তাই দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারের জন্যে বিখ্যাত। শহরের বড় বড় পাইকাররা এখানে আসেন। দুধ কিনতে। ঘি কিনতে। পনির কিনতে।

***

এক সওদাগর এল। অনেক ঠাটবাট নিয়ে। ঘি কিনবে। সারা বাজার ঘুরল। দরাদরি করে সবাইকে নাজেহাল করে ছাড়ল। দামে বনিবনা হওয়ায় কিছু ঘি কেনাও হলো। ঘি-পট্টির শেষ মাথায় একজন বুড়ি বসে আছে। ছোট একটা মাটির ঘড়া তার সামনে। নাক উঁচু ব্যবসায়ী বুড়ির কাছে গিয়ে নামমাত্র মূল্য হাঁকল। বুড়ি বলল :

-আমরা কয়েক পুরুষ ধরে ঘিয়ের কারবার করি। আমাদের ঘি এই অঞ্চলের সেরা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকেই আমরা ঘি তৈরি করি। আমরা ঘি অল্প বানাই, কিন্তু মানসম্মত বানানোর চেষ্টা করি! তেল মেশাই না। দুধের সাথে এক ফোঁটা পানি মিশতে দিই না।

-দেখি তোমার 'অঞ্চল-সেরা' ঘি!

-ওই যে আমার ঘর! সেখান থেকে নিয়ে আসতে হবে। আমার সামনের ঘড়াতে বেশি ঘি নেই!

-ঠিক আছে নিয়ে এসো!

***

বুড়ি ঘর থেকে ঘিয়ের কলস নিয়ে ফিরল। মাথায় করে। নামানোর সময় বেকায়দায় ছলকে কিছুটা ঘি সওদাগরের জামায় পড়ে গেল। সওদাগর তো রেগে আগুন। তার বহুমূল্য জরিদার জামাটা নষ্ট করে ফেলেছে বোকা বুড়ি!

-অ্যাই, আমার জামা নষ্ট করেছিস! এখন মাশুল হিশেবে গোটা কলসটা দিয়ে দিতে হবে।

-এটা দিয়ে দিলে আমি খাব কী! আজ ঘি বিক্রির টাকা দিয়েই ঘরের খাবার কেনা হবে।

-অত কথা বুঝি না। ঘি দে, নইলে টাকা দে!

-কত টাকা?

-পাঁচ শ দিরহাম!

-আমি এত টাকা কোথায় পাব? দয়া করে মাফ করে দিন।

-কোনো মাফ নেই! টাকা না থাকলে ঘিয়ের কলস দিয়ে দে।

***

বচসা-বিতণ্ডা শুনে চারপাশে লোক জমে গেল। দর্শকদের ঠেলে এক যুবক এগিয়ে এসে বলল :

-আপনার জামার দাম কত?

-পাঁচ শ দিরহাম!

-এই নিন!

ব্যবসায়ী ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে জামার জেবে পুরল। যাবার আগে নির্লজ্জের মতো বুড়িকে শুধাল :

-তোমার কলসের ঘি তো পড়ে গেছে! কিছু টাকা দিচ্ছি, কলসটা আমাকে দিয়ে দাও!

-নাহ, আমার কলস আগের মতোই পূর্ণ আছে। সামান্য ঘি পড়েছে শুধু! আর আমি আপনার কাছে ঘি বিক্রি করব না!

***

ব্যবসায়ী অন্য দিকে পা বাড়াতে উদ্যত হলে টাকা দেয়া যুবক দ্রুত এগিয়ে এসে বলল :

-চললেন কোথায়?

-কোথায় চললেন মানে? আমি যেখানেই যাই, তাতে তোমার কী?

-আমার কী মানে? আমার অনেক কিছু। আপনার সাথে তো লেনদেন এখনো শেষ হয়নি।

-জরিমানা দিয়েছ। ব্যাস, আর কিসের লেনদেন?

-আমি বুড়িমার পক্ষ থেকে পাঁচ শ দিরহাম দিয়েছি। সেটা কেন দিয়েছি?

-আমার জামার দাম!

-তা হলে আপনি জামাটা নিয়েই চললেন যে!
-জামা নিয়ে চললাম মানে? আমার জামা আমি নিয়ে চলব না তো কে চলবে?
-আপনার জামা কোথায় পেলেন? ওটা তো আমরা পাঁচ শ দিরহাম দিয়ে কিনে নিয়েছি। খুলুন জামাটা! খুলুন বলছি!
-ওটা খুললে, আমাকে পায়জামাও খুলতে হবে। কারণ, দুটো একসাথে জোড়া দেয়া।
-অতশত বুঝি না! আমারা টাকা দিয়েছি, আপনি টাকা নিয়েছেন। এখন আমাদের জামা আমাদের বুঝিয়ে দিন!
-জামা খুলে দিয়ে কি আমি উলঙ্গ হয়ে শহরে ফিরব?
-সেটা আপনার ব্যাপার, নইলে টাকা ফেরত দিন!
-তা-ই হোক! এই নাও তোমার টাকা। আমাকে রেহাই দাও!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩২

আইরিশ নৈতিকতা

জাবির সিয়াদ। একজন সুদানী তরুণ। আইরিশ মিশনারিদের সহায়তায়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে আয়ারল্যান্ডে গিয়েছিল। দেশে ফিরে সে প্রবাসজীবনের স্মৃতি তুলে ধরেছে। কয়েকটা ঘটনা বেশ অবাক করা।

(এক)

আমার বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে। পরীক্ষার ফি দিতে হবে। ৩০৯ টাকা জমা করতে হবে। তা হলে প্রবেশপত্র মিলবে। আমার কাছে ভাংতি ছিল না, তাই ৩১০ টাকা দিলাম। একটা খামে পুরে। নামধাম লিখে। এভাবেই জমা নেয়া হয়।

পরীক্ষা শেষ। লম্বা ছুটিতে বাড়ি এলাম। আবার ফিরে যাব কি যাব না, এটা নিয়ে বেশ দ্বন্দ্বে ছিলাম। ডাকে একটা চিঠি এল। খোদ আয়ারল্যান্ড থেকে। আমি তো অবাক! আমাকে চিঠি লেখার মতো ওখানে কেউ নেই! ভীষণ কৌতূহল নিয়ে ঝটপট চিঠিটা খুললাম। ভেতরে একটা ছোট্ট চিঠি আর এক টাকার একটা কয়েন। চিঠিতে সম্ভাষণের পর লেখা :

-জাবির! তুমি ভুল করে পরীক্ষার ফি এক টাকা বেশি দিয়ে ফেলেছ! সেটা ফেরত পাঠানো হলো! নির্ধারিত ফির বাইরে এক পয়সা বেশিও আমরা গ্রহণ করতে পারি না!

(দুই)

ভার্সিটি থেকে ডরমিটরিতে ফেরার পথে একজন আইরিশ বুড়ির দোকান পড়ত! টুকটাক সবজি, মনোহারী দ্রব্য, মুদিসামগ্রী ইত্যাদি বিক্রি হতো সেখানে। দোকানটা ছোট হলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় সবই সেখানে পাওয়া যেত! আমি সবকিছু বুড়ির কাছ থেকেই কিনতাম!

আমার কফি খাওয়ার বেজায় শখ ছিল। বুড়ির দোকান থেকে প্রতিবার এক প্যাকেট কোকো কিনতাম। ১৮ পেন্স দিয়ে। তাকের ওপরই দামটা লেখা থাকত! একদিন গিয়ে দেখি পাশাপাশি দুইটা তাকে কোকো রাখা! একটাতে দাম লেখা ১৮ আরেকটাতে লেখা ২০!

ভাবলাম, দুই কোকোর গুণগত মান দুই রকম তাই দামের ক্ষেত্রেও হেরফের! বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলাম!

-এই কোকোগুলো বুঝি নতুন ব্র্যান্ডের!

-নাহ! আগেরগুলোর মতোই! মানে কোনো পার্থক্য নেই!

-তা হলে দামে বেশকম কেন?

-ওহ তুমি সুদানী! আমরা কোকো আমদানি করি নাইজেরিয়া থেকে! সেখানে রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে কোকো আমদানিতে খরচ আগের তুলনায় একটু বেশি পড়ে যাচ্ছে। তাই নতুন চালানে আসা কোকোগুলো দুই পেন্স বেশি দাম রাখতে হয়েছে!

-আঠারো পেন্সের কোকো বাদ দিয়ে কি কেউ বেশি দামেরটা কিনবে? মনে তো হয় না!

-হয়তো তাই! কেউ কিনবে না!

-তা হলে আপনি নতুন কোকোর সাথে পুরোনোগুলো মিশিয়ে সবগুলোর দাম বিশ পেন্স কেন রাখছেন না? আপনি কোনটা কোন দামে কিনেছেন, সেটা কারও জানার কথা নয়! ধরতে পারারও কথা নয়?

আমার কথাটা শুনে বুড়ি ভীষণ অবাক হয়ে আমার দিকে কতক্ষণ চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন! একটু পর ফিসফিস করে বললেন :

-তুমি কোনো ভদ্র ঘরের ছেলে হলে এমন কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারতে না! বলা তো দূরের কথা! আমি আঠারো পেন্সের কোকো বিশ পেন্সে কীভাবে বিক্রি করব?

বুড়ির কথাগুলো শুনে, আমার দু-কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠলো লজ্জায়! সংকোচে!! আত্মধিক্কারে!!!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৩

মা অন্তপ্রাণ

আবদুল্লাহ মাগলুস। যাবেন দাম্মাম। দুবাই থেকে। বিমানে উঠে বসেছেন। সিটবেল্ট বাঁধাও শেষ। পাশের আসনে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। চোখ বন্ধ। এক যুবক এল। সামান্য উসখুস করে বলল :

-জনাব! আমি আপনার সাথে একটু একান্তে কথা বলতে চাই!

আবদুল্লাহ কিছুটা বিরক্তই হলেন। চেনা নেই, জানা নেই, এভাবে দুম করে একান্তে কথা বলতে চাওয়া! তাও বিমানে! সবকিছু গুছিয়ে বসার পর! বিমান ছাড়তেও আর বেশি দেরি নেই! সন্দেহ হলো, আজকাল বিমানেও ভিক্ষুক ওঠা শুরু করল নাকি!

-কী বলার এখানেই বলে ফেলুন না! অত কানাঘুষার কী আছে!

যুবক কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল,

-দয়া করে একটু উঠে এলে খুবই উপকার হতো!

-ঠিক আছে!

-এবার বলুন! কী এমন মহার্ঘ গোপনীয় আলাপ আপনার! আগেই বলে দিচ্ছি, দান-খয়রাত করার মতো টাকা-পয়সা আমার সাথে নেই।

-জি না, শায়খ! সেসব কিছু নয়! আপনার পাশে যিনি বসেছেন, তিনি আমার আম্মা!

-ও আচ্ছা! তিনি একা কেন? সাথে কেউ নেই!

-আমি আছি।

-বুঝতে পেরেছি! আমাকে সিট বদল করতে হবে! একথা বলার জন্যে এত কানাকানির কী প্রয়োজন? ওখানে বসে বললেই তো চুকে যেত!

-না না, সেটা নয়। আমার আম্মা কিছুদিন লন্ডনে ছিলেন। আব্বুর সাথে। তখন থেকেই তার বদ্ধমূল ধারণা তিনি খুব ভালো ইংরেজি জানেন। বাস্তবে ব্যাপারটা তার ঠিক উল্টো! বিমানবালারা তো ইংরেজিতে কথা বলবেন। আপনি যদি একটু কষ্ট করে, আগে বেড়ে আম্মার সাথে কথা বলে, তিনি কী খাবেন জেনে নিয়ে, বিমানবালাকে বলে দেন তা হলে অনেক উপকার হবে! মানে বিমানবালাকে সরাসরি আম্মার সাথে কথা বলতে দেয়া যাবে না!

-একথাও তো আপনি সেখানেই বলতে পারতেন।

-তখন একটা সমস্যা হতো! আমি আম্মার জন্যে আপনার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি, সেটা তিনি বুঝতে পারলে মনে কষ্ট পাবেন। আমি চাই না, ইংরেজির ব্যাপারে তার ভুল ধারণাটা ভেঙে যাক! তিনি ইংরেজি জানেন ভেবে মনে বেশ সুখানন্দ অনুভব করেন। তার মনটা বড়ই থাকুক।
-আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এ আর এমন কী! আচ্ছা, আপনি কেন মায়ের পাশে বসলেন না! তা হলে তো সহজেই সমাধান হয়ে যেত!

-আম্মার পায়ে একটু সমস্যা আছে। পিঠেও ব্যথা আছে। একটু কেলে ছড়িয়ে বসতে পারলে তার আরাম বোধ হবে। তার চেয়েও বড় কথা, আমার কাছে বিজনেস ক্লাসে দুইটা টিকেট ক্রয়ের টাকাও ছিল না। তাই ভাবলাম, আমি সাধারণ ক্লাসে যাই। আম্মু অন্তত বিজনেস ক্লাসে যান!
-তুমি তোমার মায়ের সাথেই বসো। আমি তোমার আসনে গিয়ে বসি!
-না না, আম্মু বুঝুন, তিনি আমার চেয়ে ওপরের ক্লাসে আছেন। তিনি আমার চেয়ে ঊর্ধ্বে। সচেতনভাবে তিনি এটা মেনে নেবেন না। তাকে আমি বিষয়টা অন্যভাবে বোঝানোর পর তিনি মেনে নিয়েছেন। তাকে আমি বলেছি, মায়েরা সব সময় এ-ক্লাসে করেই যাতায়াত করে!

বিমান ছেড়ে দিল। যুবক নিজ আসনে গিয়ে বসল। বিমান স্থির হওয়ার পরপরই যুবক উপস্থিত। মায়ের কিছু লাগবে কি না, কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, বার বার খোঁজ নিয়ে চলে গেল। প্রতি দশ মিনিট পরপরই এসে দেখে যেতে লাগল। বলতে গেলে পুরো যাত্রপথই সে মায়ের আশেপাশে আনাগোনা করে কাটিয়ে দিল।

দাম্মাম নেমে, যুবক আবদুল্লাহ মাগলুসকে জড়িয়ে ধরল।
-আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। আপনি আমার মা-কে পুরো পথ খুবই যত্নের সাথে আগলে রেখেছেন। আল্লাহ আপনার মাকেও এভাবে আরামে রাখুন!
-আরে কী লজ্জা! তুমি আমাকে সে সুযোগ দিলে কোথায়! তুমিই তো সারাক্ষণ মায়ের সাথে লেগে ছিলে। কৃতজ্ঞতা তো আমারই তোমার প্রতি প্রকাশ করতে হয়!
-কেন?
-তোমার কাছেই তো মায়ের প্রতি সন্তান কেমন আচরণ করবে, তা শিখলাম!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৪

চাওয়া-পাওয়া

বড় এক শাসক হজে এসেছেন। তার খুউব ইচ্ছে, এখানকার আলেম-ওলামার খেদমত করবেন। সেবাযত্ন করবেন। কদর-তাযীম করবেন। লোক-লশকর লাগিয়ে দিলেন। ইচ্ছেমতো দিরহাম-দিনার বিলালেন।

-আর কেউ বাদ পড়েছে?

-জি না জাহাঁপনা! তবে একজন আলিম আমাদের কোনো সাহায্য গ্রহণ করতে সম্মত হননি?

-কেন! পরিমাণে কম দিয়েছ?

-জি না, আপনি যা বলেছেন তাই তাকে একটা থলেতে করে দিয়েছি। রাজি না হওয়াতে কয়েকগুণ বাড়িয়েও দেখেছি। কিছুতেই নিলেন না।

-আচ্ছা তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।

-জি না। তিনি কারও কাছে আসতে চান না।

-ঠিক আছে, আমাকে পথ দেখিয়ে তার কাছে নিয়ে চলো!

রাজা আলিমের কাছে গেলেন। প্রাথমিক আলাপের পর বললেন :

-আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে! আপনার কোনো প্রয়োজনের কথা আমাকে বলুন!

-আমার শরম লাগে!

-আচ্ছা, আমি সবাইকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। কেউ দেখবে না।

-আমি তো মানুষকে শরমাচ্ছি না!

-কাকে?

-আল্লাহকে! তাঁর ঘরে বসে, অন্যের কাছে চাইব! কেমন দেখায় না? আপনার সন্তান আপনার দরবারে বসে অন্যের কাছে সাহায্য চাইলে, আপনার কাছে কেমন লাগবে?

রাজা নাছোড়বান্দা! আলিমের পিছে লোক লাগিয়ে রাখলেন। তিনি হারাম থেকে বাইরে এলেই খবর দিতে বললেন। সময়মতো খবর দেয়া হলো। তড়িঘড়ি করে গেলেন।

-এখন তো মসজিদের বাইরে আছেন। এবার কিছু চাইতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

-জি না নেই।

রাজার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। ভাবটা এমন, ফাঁদ দেখেছ ঘুঘু দেখনি! খই ছড়ালে কাকের অভাব কোন কালে হয়েছে?
-এখন কেউ দেখবে না। আপনি আপনার প্রয়োজন বলুন।
-একটা সমস্যা নিয়ে সারাক্ষণ জর্জরিত হয়ে আছি। কেউ সাহায্য করতে পারছে না। আপনি পারবেন?
-কেন পারব না? অবশ্যই পারব। নির্দ্বিধায় বলুন।
-আমার নামটা জাহান্নামীদের তালিকা থেকে কেটে, জান্নাতীদের তালিকায় বসিয়ে দিন।
-এটাই আপনার চাওয়া?
-জি।
-এটা তো আমার সাধ্যের বাইরে।
-তা হলে আপনার কাছে আমার চাওয়ার কিছু নেই! আপনিও আমার মতোই অসহায়! শুধু শুধু আমার পিছে সময় নষ্ট না করে, নিজের নাম কাটাতে পারেন কি না দেখুন!

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৫

উচিত শাস্তি

ব্রিগেডিয়ার মাহমুদ শাইত। লেবানিজ বাহিনীর সেনা কর্মকর্তা ছিলেন। একটা স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন,
-হাসপাতালে গেলাম চেকাপের জন্যে। ডাক্তার পরামর্শ দিল ভর্তি হতে। আমার ওয়ার্ডে ছিল বেশ কিছু রোগী। সামরিক হাসপাতাল হওয়ার কারণে বেশির ভাগ রোগীই ছিল সামরিক কর্মকর্তা। কেউ বর্তমানে কর্মরত, আবার কেউ অবসরপ্রাপ্ত।

প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে ওঠার পর, আশেপাশের রোগীদের সাথে পরিচিত হতে শুরু করলাম। নানা অবস্থার রোগী। কেউ পঙ্গু, কেউ অর্ধাঙ্গ, কেউ বিকলাঙ্গ! শয্যার পাশে গেলে প্রত্যেকেই গুরুত্ব দিয়ে আমার সাথে কথা বলছিল। আমি অফিসার পর্যায়ের মানুষ হলেও, সাধারণ সেনাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে চলাটা আমার পছন্দ ছিল না। যতটা সম্ভব অন্য অফিসারদের চোখ বাঁচিয়ে সিপাইদের সাথে মেশার চেষ্টা করতাম।

এই হাসপাতালে অবশ্য সিপাই গোছের কেউ আসার উপায় নেই। তবুও বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, সেই অলিখিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। অসুস্থদের সাথে কথা বলার সময়, তাদের আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করলাম। তারা যাতে সময়টা প্রফুল্লভাবে কাটাতে পারে, সে জন্য হাসির কথা বললাম। আমার পিএকে দিয়ে তাদের জন্যে ছোটখাটো উপহারেরও ব্যবস্থা করলাম।

একজন রোগী খুবই কষ্ট পাচ্ছিল। সারাক্ষণ চিৎকার করে চলছিল। ব্যথায় থাকতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদছিল। তার জন্যে ওয়ার্ডের অন্যদেরও স্বাভাবিক ঘুম-বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটছিল। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে অভিযোগ করছিল না। তার পেছনে বিশেষ সময় দেয়ার জন্যে, তার ব্যথা কমে এলে শিয়রে গিয়ে চেয়ার টেনে বসলাম। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। সে যা বলল আমি তা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।
-স্যার! আমি ছিলাম ফরাসি বাহিনীর বিশেষ সদস্য। স্বাধীনতার আগের কথা বলছি। সামরিক বাহিনী থেকে আমাকে পুলিশ বিভাগে স্থানান্তর কর হলো। আমার আনুগত্য দেখে, ফরাসি কর্তৃপক্ষ নানা দায়িত্ব চাপাতে শু করল। বেশির ভাগই ফরাসি বিরোধী নেতাকর্মীদের ধরে এনে, জেলে পুরে রাখা। প্রয়োজন হলে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে অন্যদের সংবাদ বের করা।

শেষের দিকে তারা আমার প্রতি এতই আস্থাশীল হয়ে উঠল যে, বিপজ্জনক ত্যাড়া কোনো কয়েদি জেলে এলে, তাকে আমার কাছেই সোপর্দ করা হতো। এমনকি ফরাসি বিদ্রোহী বন্দী থাকলেও, আমার কাছে নিয়ে আসা হতো। আমার দায়িত্বই ছিল পিটিয়ে মুখ খোলানো। আমার টর্চার সেন্টারে প্রায় ৮৪ প্রকারের নির্যাতন-সামগ্রী ছিল। যত কঠিন বন্দীই হোক, এর যেকোনো একটার হাতে তাকে নতি স্বীকার করতেই হতো। ফরাসি সরকার আমার কাজে বেজায় খুশি হয়ে, আমাকে নানা অভিধায় ভূষিত করল। নানা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সম্মানিত করল। মেডেলে মেডেলে আমার শোকেস ভর্তি করে ফেলল।
-তোমার এই অসুস্থতা কখন থেকে?
-চাকরি ছাড়ার পর থেকেই!

-ডাক্তার কী বলেছে?

-ডাক্তার বলেছেন, ভালো হয়ে যাবে।

-আমার কী মনে হয় জানেন স্যার!

-কী মনে হয়?

-আমার এই রোগ ইহজনমে সারবে না।

-কেন তোমার এমন মনে হলো?

-আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে, আল্লাহ আমাকে হাজারো নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন করার শাস্তি এই দুনিয়া থেকেই দিতে শুরু করেছেন।

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৬

একদিনের রাজা

দীর্ঘকাল ধরে দেশটা রাজাশূন্য। বড় রাজা মারা যাওয়ায় উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়নি, রাজা হওয়ার মতো। রাজা ছিলেন আঁটকুড়ো। নিঃসন্তান। উত্তরাধিকারী হওয়ার মতো কোনো আত্মীয়ও ছিল না। উজিরদের মধ্যেও সর্বজনমান্য কেউ ছিল না। এহেন সংকটে দেশে অচলাবস্থা তৈরি হলো। কিন্তু রাজপদ যে শূন্য রাখা যাবে না।

***

গণ-পরামর্শসভার আহ্বান করা হলো। দীর্ঘ যুক্তি-তর্কের পর ঠিক হলো, আপাতত একজনকে সাময়িকভাবে রাজা ঘোষণা করা হবে। এক বছর মেয়াদের জন্যে। নতুন রাজা নির্বাচিত হলো। তার মাথায় মুকুট পরিয়ে, সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হলো। কিছুদিন পরই নতুন রাজার বিরুদ্ধে মানুষ ফুঁসে উঠল। রাজার স্বজনপ্রীতি, অপরিমিত ভোগবিলাস, সীমাহীন কুঁড়েমি. রগচটা স্বভাবের কারণে রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্য দেখা দিল। সবাই মিলে বসে ঠিক করল, রাজাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। দূরের এক দ্বীপে নির্বাসিত করা হবে। সেখান থেকে যাতে কোনো দিন ফিরতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন আইন করা হলো, কেউ স্বেচ্ছায় রাজা হতে চাইলে, তাকে আগের রাজার পরিণতি ভোগ করতে হবে। বছর শেষে তাকে দ্বীপে নির্বাসন নিতে হবে। নিজে নিজে চলে গেলে তো ভালো, নইলে ধরে বেঁধে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এমন আইন জানার পরও রাজা হওয়ার মতো মানুষের অভাব হলো না। আসলে পদের মোহ সামলোনো খুবই কঠিন।

***

এভাবেই চলছিল। রাজা যায় রাজা আসে। সব রাজাই তার পরিণতির কথা জানে। দ্বীপে নির্বাসিত সাবেক রাজাদের কেউ বেঁচে নেই, বাঘ-ভালুক তাদের খেয়ে ফেলেছে, এটাও তারা জানে। তবুও লোভের শিকার সবাই। কয়েক বছর পর অবশ্য মোহভঙ্গ ঘটতে শুরু করেছিল। তখন সবাই মিলে ঠিক করল, প্রার্থী পাওয়া না গেলে, সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট একজনকে রাজা বানানো হবে। জোর করে।

***

এবার রাজা হলো একজন যুবক। বুদ্ধিমান শিক্ষিত। গত কয়েক বছরের মতো এবারও জোর-জবরদস্তি করে রাজা বানানো হলো। যুবক রাজা মসনদে বসেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। প্রথমেই নির্বাচন কমিটিকে হাত করলেন। পুরো দেশের বাছাই করা যুবকদের নিয়ে নিজস্ব একটা বলয় গড়ে তুললেন। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে নিজের লোক বসিয়ে দিলেন। কেউ জানতে না পারে মতো করে।

রাজ্যের অভ্যন্তর ঠিক হওয়ার পর, এবার মনোযোগ দিলেন ভিন্ন দিকে। যুবক রাজা গোপনে একান্ত কিছু অনুচর নিয়ে নির্বাসন দ্বীপ পরিদর্শনে গেলেন। পুরো দ্বীপটাই গহীন অরণ্য। নানারকম হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি। থেকে থেকে পিলে চমকানো তর্জন-গর্জন ভেসে আসছে। আগেকার রাজাদের ছিন্নমস্তা কঙ্কাল এখানে-সেখানে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। শকুন উড়ছে মাথার ওপর।

রাজা ফিরে এলেন। কয়েকদিন পর নিজের কিছু অনুগত লোক সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের প্রথম কাজ, দ্বীপকে হিংস্র জানোয়ারমুক্ত করা। দ্বিতীয় কাজ হলো, পুরো দ্বীপের বন-জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলা। তৃতীয় কাজ হলো দ্বীপ বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং মনোরম সুরম্য একটা প্রাসাদ নির্মাণ করা।

আস্তে আস্তে সবকাজ সমাপ্ত হলো। লোকবল আরও বাড়ানো হলো। প্রশিক্ষিত একদল সেনাও মোতায়েন করা হলো। পাশের রাজার মেয়েকেও কৌশলে বিয়ে করে ফেললেন। পরিণতির কথা ভেবে, প্রথম প্রথম মেয়েপক্ষ রাজি না হলেও, যুবক রাজা একদিন প্রতিবেশী রাজার সাথে সরাসরি দেখা করে দীর্ঘ বৈঠক করলেন। এরপর মেয়েপক্ষ থেকে আর

কোনো আপত্তি দেখা গেল না। বরং যেচেই মেয়ে দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল।

***

এদিকে দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। এবার রাজাকে নির্বাসিত করার পালা। প্রতিবছর রাজাদের জোর করে জাহাজে তুলতে হয়। এবার দেখা গেল, যুবক রাজা নিজেই সব আয়োজন দেখাশোনা তদারক করছে। তাকে হাসিমুখে সবকিছু দেখভাল করতে দেখে, নির্বাচন কমিটির সবাই অবাক। ব্যাপার কী? নিজের অন্তিম যাত্রায় কেউ এভাবে হাসিখুশি থাকতে পারে? রাজাকে জাহাজে তুলে দেয়ার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেলল,

-রাজামশাই! আপনি এত খুশি যে! অতীতের রাজারা তো জাহাজে ওঠার আগেই ঘন ঘন মূর্ছা যেত।

-আমি জাহাজে উঠে নোঙর তোলার পর কারণটা বলব।

-ঠিক আছে।

-শুনুন! আমি খুশি কেন, সেটা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কথা হলো, আমি কাঁদব কেন? গত একবছর ধরে আমি তো দ্বীপটাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। মনের মতো করে সাজিয়েছি। আগের রাজাদের মতো বেখবর হয়ে বিলাস-ব্যসনে মশগুল ছিলাম না। না না, আপনাদের কারও একটা পয়সাও আমি না-হক আত্মসাৎ করিনি। আমার পিতৃপ্রদত্ত নগদ অর্থকড়ি আর মাসিক বেতনই শুধু এ কাজে ব্যয় করেছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে বিপুল অর্থসম্পদ লাভ করেছিলাম। সেটাও দ্বীপে লগ্নি করেছি। এখন পুরো দ্বীপ একটা শান্তির আবাস। আপনাদের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি, আমার নতুন রাজ্যে কেউ বাস করতে চাইলে, আসতে পারেন। খবরদার! ঘুণাক্ষরেও কেউ মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আসবেন না। সেখানে আমার সুশিক্ষিত একদল বাহিনী আছে। তারা আপনাকে জীবিত ছাড়বে না।

***

রাজা চলে গেলেন। দ্বীপে গিয়ে মনের সুখে বাকি দিনগুলো কাটাতে লাগলেন। দুনিয়াতে আমাদের অবস্থাও এমন। আমরা দুনিয়াতে থাকাবস্থাতেই আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলে পরকালে আগুনে জ্বলতে হবে না।

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৭

বুদ্ধিমান বালক

রাজা যুদ্ধে যাচ্ছেন। লোক-লশকর নিয়ে। সীমান্তের দিকে। সারাদিন একটানা পথচলার পর, রাজা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিলেন। এক গাঁয়ের বাইরে বিশাল তেপান্তর মাঠে। রাজা এসেছেন শুনে চারপাশ থেকে লোকজন নানা উপহার-উপাচার নিয়ে আসতে শুরু করল। রাজা তাদের গ্রামের পাশে এসেছেন, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। এই সুবর্ণ সুযোগ, রাজাকে যদি খুশি করা যায়, বলা যায় না, গাঁয়ের উন্নতি হতেও পারে। যার কাছে যত মূল্যবান বস্তু ছিল, রাজাকে ভেট দিতে শুরু করল। রাজাও ভাবলেন, মন্দ কী, যুদ্ধের বাজার! প্রজারা এভাবে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করলে, বাজেট পুরুষ্ট হবে।

খোলা ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে রাজা বসে রইলেন। প্রজারা একে একে এসে উপহার রেখে যাচ্ছে। রাজার চোখ পড়ল এক বালকের ওপর। বই হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে কাছে ডাকলেন।

-কী নাম তোমার?

বালক একটুখানি কী যেন ভাবলো। তারপর বলল :

-আমার নাম 'ফাতিহ' (বিজয়ী)!

রাজা ভীষণ খুশি হলেন। যুদ্ধে যাওয়ার মুহূর্তে এমন শব্দ নিশ্চয়ই কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী!

-কোথায় যাচ্ছ?

-শিক্ষকের কাছে। রাতের পড়া শিখতে।

রাজা আরও খুশি হলেন। এই অজপাড়াগাঁয়েও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি মানুষের ঝোঁক আছে তাহলে!

-তা বাছা! তোমার আজকের পড়া কি বলতে পারবে?

-ইন্না ফাতাহনা লাকা! (আমি আপনাকে বিজয় দান করেছি)।

রাজা এবার আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। বালককে জড়িয়ে ধরলেন।

-ঠিক আছে, তুমি এখন মাদরাসায় চলে যাও!

***

রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন। শত্রুকে পর্যুদস্ত করে শান-শওকতের সাথে ফিরতি পথ ধরলেন। পথে পড়ল সেই গ্রাম। রাজার খাহেশ হলো, বালক ও তার শিক্ষকের সাথে দেখা করবেন। যুদ্ধের আগমুহূর্তে এমন শুভ কথা শোনানোর জন্যে দুজনকে পুরস্কৃত করবেন। তাঁবুতে একটু বিশ্রাম নিয়েই রাজা উজিরকে নিয়ে মাদরাসায় গিয়ে হাজির হলেন। শিক্ষক পরম সমাদরে রাজাকে অভ্যর্থনা জানালেন। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই রাজা সেদিনের বালককে খুঁজতে শুরু করলেন। বালক একদম এককোণে সবার পেছনের সারিতে বসে আছে। রাজা অবাক! শিক্ষককে বললেন,

-আমি ওই পেছনে বসা বালকটির সাথে কথা বলতে চাই! তার পড়া শুনতে চাই!

শিক্ষক জোরে ডাক দিলেন :

-আবেস (গোমড়ামুখো)! এদিকে এসো। জাহাঁপনাকে পড়া শোনাও।

বালক পড়তে শুরু করল :

-আবাসা ওয়া... (সে ভ্রুকুটি করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ তার কাছে এল একজন অন্ধ।)

রাজা অবাক! নাম-পড়া কিছুই যে মিলছে না! কী ব্যাপার! রহস্য কী?

-তুমি আমাকে সঠিক নাম বলোনি কেন? আর পড়ার কথাও ঠিকমতো বলোনি যে?

-জাহাঁপনা! আমি ছোট্ট মানুষ। আপনি দেশের রাজা। আপনি যখন আমাকে নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন চিন্তা করে দেখলাম, আপনি এতবড় মানুষ হয়ে, কোনো কারণ ছাড়া আমার নাম জিজ্ঞেস করতে পারেন না। আরও দেখলাম, আপনি দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্যে যুদ্ধে যাচ্ছেন। তাই আমি ভালো কিছুর ইঙ্গিত বোঝানোর জন্যে নাম বলেছি 'ফাতিহ' আর পাঠ বলেছি 'ইন্না ফাতাহনা'।

রাজা যারপরনাই অবাক হলেন। এতটুকুন বালক এত গভীরভাবে ভাবতে শিখেছে! উজিরকে বললেন :

-ছেলেটাকে এক দিনার পুরস্কার দিয়ে দাও!

বালক এক দিনার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। উজির রেগে গিয়ে বলল :

-তুমি রাজার দানকে অবহেলা করছ?

-জি না, আমি রাজার দানকে অবহেলা করছি না। সম্মান দেয়ার চেষ্টা করছি।

-কীভাবে?

-আমি বাড়ি গিয়ে বাবার হাতে এক দিনার তুলে দিলে, তিনি জানতে চাইবেন, আমি সেটা কোথায় পেয়েছি? যদি বলি রাজা দিয়েছেন, আব্বু বিশ্বাস করবেন না।

-কেন বিশ্বাস করবেন না?

-কারণ, রাজা কখনো এক দিনার দেয় না!

বালকের বুদ্ধিমত্তায় রাজা আরও বেশি চমৎকৃত হলেন। তাকে এক শ দিনার দিয়ে বিদায় করা হলো।

***

রাজাকে সব সময় পাওয়া যায় না। দরবারে গিয়েও সুযোগ পাওয়া মুশকিল। গ্রামের লোকজন ঠিক করল, রাজার কাছে তাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরবে। গ্রামের পঞ্চায়েত নেতা রাজাকে তাদের সমস্যাগুলোর কথা জানাল। গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ জানাল। রাজা দুষ্টলোকদের ধরে আনার হুকুম দিলেন। রাজার নির্দেশ শুনে দুষ্টলোকেরা আগেই ভেগেছিল। কেবল একজনকে পাওয়া গেল। রাজা ঘোষণা দিলেন পরদিন তার বিচার হবে। সবার সামনে। খোলা ময়দানে।

***

ময়দান লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। মানুষ গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। অপরাধীকে মাঠে নিয়ে আসা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ। বালকও এল। না এসে উপায় নেই। কারণ, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তি তার পিতা। সে বুঝতে পারছিল না, তার করণীয় কী? বাবাকে মেরে ফেললে, তারা এতিম হয়ে পড়বে। চিন্তাভাবনা করে, রাজার কাছে গেল। রাজা তাকে কাছে ডেকে আদর করে বসালেন।

-কিছু বলতে এসেছ?

-জি জাহাঁপনা!

-বলো।

-আজ যার বিচার করা হবে, তিনি আমার পিতা।

-বলছ কী তুমি? অসম্ভব!

-অসম্ভব হতে যাবে কেন? সত্যি সত্যি তিনি আমার জন্মদাতা। আমি মুক্তিপণস্বরূপ এক শ দিনার নিয়ে এসেছি! আপনি দয়া করে যদি তাকে মুক্তি দিতেন!
-আশ্চর্য! কত ভালো ছেলে আর কত মন্দ পিতা!
-জাহাঁপনা, এভাবে বলবেন না।
-কীভাবে বলব?
-বলুন, কত ভালো পিতা আর কত মন্দ 'দাদা'! আমার বাবার অনেক দোষত্রুটি থাকলেও তিনি আমাকে ভালো ছেলে হিশেবে গড়ে তুলতে চেষ্টায় কসুর করেননি। কিন্তু আমার দাদা তার সন্তানকে গড়ে তোলার পেছনে সময় দেননি!
-ঠিক আছে, তোমার সম্মানে আমি তোমার পিতাকে মুক্তি দিলাম!

***

গল্পের বার্তা :

- প্রতিটি পিতারই উচিত সন্তানকে আদব-আখলাক শিক্ষা দেয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া।
- কেউ প্রশ্ন করলে, চট করে উত্তর না দিয়ে, একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দেয়া।
- শুধু বুদ্ধিমত্তা থাকলেই হয় না, সাথে আদবও থাকা চাই! দুয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলেই মানবজীবনে সুখ ও সৌভাগ্য এসে ধরা দেয়।

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৮

এ যুগের খাওলা

হাদিয়া জুরহাম। আলজিয়ার্স এয়ারপোর্টে বসে আছেন। একা। নিঃসঙ্গ। চোখে আঁসুর তুফান। স্বামী সদ্য ছেড়ে যাওয়া ফ্লাইটে চলে গেছেন। গন্তব্য বায়তুল্লাহ। সাদিয়া জুরহাম যেতে চাননি। স্ত্রীকে ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু হাদিয়া নিজের জন্যে স্বামীকে আটকে রাখতে চাননি। জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন,
-আমিও ইনশাআল্লাহ আসছি। তুমি চলে যাও। জেদ্দায় নেমে অপেক্ষা কোরো। হিশাম গতকাল বলেছে, সে আমাদের নিতে আসবে। বউমাও

আসবে। তুমি চিন্তা কোরো না। আমরা সারাজীবন তিল তিল করে প্রস্তুতি নিয়েছি। এ বৃদ্ধ বয়েসে আল্লাহ আমাকে মাহরূম করবেন, মনে হয় না। আমার কাগজপত্রে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটা আশা করি আল্লাহর রহমতে কেটে যাবে। দেখে নিয়ো, আমি ঠিকই পৌঁছে যাব। আমি তো একা আটকা পড়িনি। দেখো, আরও অনেক যাত্রীরও কাগজপত্রের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বৃদ্ধা হাদিয়া বিমানবন্দরে বসে বসে ভগ্নহৃদয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করে যেতে লাগলেন। বিদায় দিতে আসা ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ফিরে যেতে অনেক করে বোঝাল। বৃদ্ধার এক কথা,

-যার ঘরে যাওয়ার জন্যে ঘর বের হয়েছি, তিনি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন, এটা বিশ্বাস হয় না। তিনি এমন নন। আমি চিন্তা করে দেখছি, আমার কোনো সমস্যা আছে কি না।

বিমান তখনো আলজেরিয়া সীমান্ত পার হয়নি, পাইলট হঠাৎ বিমানের পেছন দিকে একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলেন। সাথে সাথে কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করলেন। জরুরি অবতরণ করতে বলা হলো। বিমান ফিরে এল।

বিমানবন্দরে হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। বিমান জরুরি অবতরণ করতে যাচ্ছে। সবাই আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে থাকল। বিমানের কী ক্ষতি হয়েছে, কতটুকু হয়েছে, আগ বাড়িয়ে বলা যাচ্ছে না।

আটকে পড়া যাত্রীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল, আগে কম্পিউটারের সার্ভারে সমস্যার কারণে ভুল তথ্য দিয়েছিল। সবার কাগজপত্র নিখুঁত। তাদের ভ্রমণে কোনো সমস্যা নেই।

বিমান অবতরণ করার পর বিশেষজ্ঞরা ছুটে গেল। তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিস্ফোরণের কোনো আলামত খুঁজে পেল না। বিমান এক শ ভাগ সচল। কোনো ত্রুটি নেই। আটকে পড়া যাত্রীদের নিয়ে বিমান আবার উড়াল দিল। বায়তুল্লাহর পানে। নবীজির দেশে।

জীবন জাগার গল্প : ৬৩৯

আল্লাহর সন্তুষ্টি

উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ. মারা গেছেন। এরপর খলীফা হলেন ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক। প্রজাদের প্রতি তিনি খুব একটা সদয় ছিলেন না। লোকে তাকে জালিম বলেই জানত।

খলীফা হয়েই ইরাকের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন উমর বিন হুবাইরাকে। উমর ইরাকে এসে নিজের মতো করে শাসন করতে থাকলেন। এদিকে ইয়াজিদ দামেস্ক থেকে চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছেন। নানাবিধ আদেশসম্বলিত। অনেক সময় আদেশগুলো জুলমেরও হতো। উমর জুলুমের আদেশগুলো না মেনে, চিঠিগুলো ভাঁজ করে রেখে দিতেন। একপর্যায়ে গিয়ে আর খলীফার আদেশকে পাশ কাটানো সম্ভব হলো না। তিনি তৎকালীন বড় দুই ইমাম হাসান বসরী ও শা'বী রহ. কে পরামর্শের জন্যে ডাকলেন। পুরো অবস্থাটা তুলে ধরে বললেন :

-আমীরুল মুমিনীন আমাকে ইরাকের গভর্নর করে পাঠিয়েছেন। তিনি মাঝেমধ্যে এমন এমন ফরমান পাঠান। সেগুলো বাস্তবায়ন করলে মানুষ শহর ছেড়ে পালাবে। এখন আমি কী করতে পারি? আমি খলীফার অন্যায় আদেশ মান্য করব?

হযরত শা'বী রহ. একটা সমাধান দিলেন। তাতে দু-কূলই রক্ষা হলো। খলীফাও না চটেন, গভর্নরও না রাগেন।

***

হযরত হাসান বসরী রহ. চুপ করে রইলেন। উমর বললেন :

-কই! আপনি তো কিছু বললেন না?

-ইবনে হুবাইরা, তুমি ইয়াজিদকে মানার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহকে মানার ব্যাপারে ইয়াজিদকে ভয় কোরো না। আল্লাহ তোমাকে ইয়াজিদ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন। ইয়াযিদ তোমাকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না।

ইবনে হুবাইরা, তোমার ওপর এমন এক কঠোর ফিরিশতা নাজিল হবেন, যিনি আপন রবের আদেশ অমান্য করেন না। তিনি তোমাকে সিংহাসন থেকে আছড়ে ফেলবেন। তোমাকে এই বিশাল প্রাসাদ থেকে বের করে

কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। সেখানে তুমি ইয়াজিদকে পাবে না। পাবে তোমার আমলকে, যা তুমি ইয়াজিদের রবের অবাধ্য হয়ে করবে।

ইবনে হুবাইরা, তুমি যদি আল্লাহর সাথে থাকো, তার আনুগত্য করো, তা হলে তিনিই তোমার জন্যে যথেষ্ট। দুনিয়া-আখেরাতে তিনিই তোমাকে ইয়াজিদের রোষ থেকে রক্ষা করবেন। আর তুমি আল্লাহর নাফরমানি করে ইয়াজিদের সাথে থাকলে আল্লাহ তোমাকে ইয়াজিদের হাতেই সোপর্দ করে দেবেন।

ইবনে হুবাইরা, সৃষ্টি যে-ই হোক না কেন, স্রষ্টার নাফরমানি করে সৃষ্টির আনুগত্য চলে না।

***

উমর বিন হুবাইরা এ নসীহত শুনে কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেললেন। হাসান বসরী ও শা'বী রহ.-কে সসম্মানে বিদায় দিলেন। ইমাম দুজনকে গভর্নরের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে আশপাশ থেকে মানুষ জড়ো হয়ে দুজনকে ঘিরে ধরল।

-আপনাদের গভর্নর কী বলেছেন?

শা'বী রহ. বললেন :

-উপস্থিত ভাইয়েরা, আমাদের সবার উচিত সব কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া। আমি আজ গভর্নরের সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি।

পক্ষান্তরে হাসান বসরী রহ. আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলেন। গভর্নরের সন্তুষ্টি চাননি। ফলে আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, গভর্নরও সন্তুষ্ট হয়েছে।

***

আমরা সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেব; বান্দার নয়। ইনশা আল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প : ৬৪০

মায়ের ভালোবাসা

বিয়ের পর অনেক বছর কোনো ছেলেপিলে হয়নি। চেষ্টা-তদবিরে নিঃসন্তান দম্পতি কোনো ঘাটতি করেনি। আশা ছেড়ে দেয়ার উপক্রম। আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। মাঝ বয়েসে একটা পুত্রসন্তান দান করলেন। আকাশের চাঁদ হাতে জুটল।

***

ছেলেকে ভালো স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হলো। বাবা-মা না খেয়ে ছেলের খরচ জোগাল। চেষ্টা বৃথা যায়নি। ছেলে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হলো। চাকরি পেতেও দেরি হলো না। মাইনেপত্রও ভালো। থাকার বাসাও জুটেছে একখানা। বাবা-মাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এল। কিন্তু বুড়ো-বুড়ির শহরে ভালো লাগে না। হাঁপ ধরে যায়। গ্রামেই ভালো লাগে। বাবা একদিন ছেলেকে বললেন :

-বাবা, তুই তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা নে। তোর জন্যে তো শহুরে মেয়েই ভালো হবে। আমরা তো এখানে কাউকে চিনি না। তোর চিন-পরিচয় থেকে পছন্দসই পাত্রীর খোঁজ পাওয়া যায় কি না দেখ!

কিছুদিন পর বিয়ে হলো। মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে চলে এলেন। সপ্তাহান্তে ছেলে-বউ মিলে একবার দেখা করে যেত। সন্তান হবার পর আসা-যাওয়াটা কমে গেল। আর বড়লোক বধূরও গ্রামে আসতে ভালো লাগত না। স্বামীর ঘন ঘন গ্রামে আসাও পছন্দ করত না। গ্রামের সাথে সম্পর্ক অনেকটা ছিন্ন হয়ে গেল। সৌদি আরবে একটা কোম্পানিতে চাকরির আবেদন করার সাথে সাথে গৃহীত হলো। শুরু হলো বিদেশের জীবন। আগে তো ছ'মাসে-ন'মাসে একবার হলেও গ্রামে যাওয়া হতো। এবার তাও বন্ধ হয়ে গেল।

★★★

মক্কায় আসার কথা শুনে মা-বাবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তারা সানন্দেই অনুমতি দিয়েছিলেন।

-বাবা তুমি নবীর দেশে যাবে। সেখানে সার্বক্ষণিক থাকবে, সে তো আনন্দের কথা। আমাদের তো যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তুমি গেলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব। নিজে না গেলেও ছেলে-বৌমা কাবার দেশে আছে।

★★★

মক্কায় থাকার সুবাদে প্রতি বছরই হজ করার সৌভাগ্য হয়। এবারও হলো। হজের পর একদিন মাতাফে বসে আছে। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ। পাশে বসা ছিলেন এক বৃদ্ধলোক। তিনি জানতে চাইলেন :

-তোমাকে অনেকক্ষণ যাবৎ লক্ষ করছি, মুখ গোমড়া করে বসে আছ। কোনো সমস্যায় পড়েছ? সামনেই বায়তুল্লাহ! এখানে তো কেউ সমস্যা নিয়ে বসে থাকে না!

-জি, ঠিক ধরেছেন। একটা ভিন্নধর্মী সমস্যায় পড়েছি। আপনি অপরিচিত। কীভাবে বলি!

-একান্ত গোপনীয় কিছু না হলে বলতে পার। আল্লাহ হয়তো একটা পথ খুলে দেবেন।

-গতরাতে ঘুমিয়ে ছিলাম। আধো ঘুম, আধো জাগরণের মাঝে আছি। কে যেন আমার কানের কাছে এসে বলল :

-তোমার হজ তো কবুল হয়নি!

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তখন থেকেই মনে তোলপাড় চলছে।

-শোনো বেটা, তুমি কি এমন কোনো গুনাহ করছ, যার কুফলটা সারাক্ষণ তোমার পিছু তাড়া করে ফিরছে?

-জ্ঞানত কোনো পাপ তো করি না!

-বাড়িতে মা-বাবা আছেন?

এবার তার টনক নড়ল। চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল :

-জি। বাড়িতে মা-বাবা আছেন। এবং আমার গুনাহটা কী সেটাও বুঝতে পারছি।

***

প্রায় বারো বছর কেটে গেছে। মা-বাবার সাথে দেখা নেই। যোগাযোগ নেই। ছেলে হজের বাকি কাজ সেরে আর দেরি করল না। কোম্পানি থেকে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে এল। গ্রামের মুখেই অনেক পরিচিত মুখের সাথে দেখা। একজনের কাছে বাবা-মায়ের কথা জানতে চাইল।

-ও! তোমার বাবা তো গত মাসে মারা গেছেন। মা হয়তো বেঁচে আছেন।

ছেলের মনে তোলপাড় শুরু হলো। হায় হায়! কী করেছি আমি! কতটা নিমকহারামি করেছি! একপ্রকার দৌড়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এল। ঘরটার বড় জীর্ণ-দীর্ণ দশা। পড়ো পড়ো। কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। দুয়ারে গিয়ে পা আর উঠতে চাইছে না। না জানি কী খবর অপেক্ষা করছে। দুরুদুরু বক্ষে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল। মা কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। মুমূর্ষু অবস্থা। পাশের বাড়ির এক মহিলা শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ছেলে মুখের কাছে কান নিয়ে শুনল। তিনি বলছেন,

-ইয়া আল্লাহ, আপনি আমার নাড়ির ধনকে ফিরিয়ে দিন। তাকে সুস্থ রাখুন। মরার আগে তাকে একবার হলেও দেখতে চাই।

***

ছেলে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল :
-মা গো, এই যে আমি এসেছি।
মা হাত তুলে ছেলের কপালে ছোঁয়ালেন। পাশের মহিলা বললেন :
-উনি চোখে দেখতে পান না। আপনি চৌকির ওপর তার কোল ঘেঁষে বসুন।
মা ক্ষীণস্বরে বললেন :
-আয়, কাছে আয়। তোর গায়ের ঘ্রাণটা শুঁকি। চোখে তো দেখব না, একটু ছুঁয়ে হলেও তোকে অনুভব করি।
চার দিন পর মা মারা গেলেন।

জীবন জাগার গল্প : ৬৪১

দাওয়াতের ময়দানে

ঘটনাটা জানা। অমুসলিমদের দাওয়াতদানের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের মতো। তবুও তাকে আবার জানলে ক্ষতি কী?। শায়খ দিদাত রহ.-এর কথা বলছি। তার একটা স্মৃতিচারণ চোখে পড়ল।

-আমি তখন অ্যাডামস মিশনের অদূরে এক দোকানে চাকরি করি। মিশনটা ছিল খ্রিষ্টান যাজকদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। তাদের শেখানো হতো, কীভাবে মুসলমানদের ধর্মান্তর করা যাবে। কীভাবে তাদের সাথে কথা বলতে হবে। কোনো কথা বললে সাধারণ মুসলমানকে ফাঁদে ফেলা যাবে।

***

আমাদের দোকানেও তরুণ যাজকরা আসত। এটা-সেটা কিনত। টুকিটাকি কেনাকাটার ফাঁকে টুকটাক কথাও হতো। তারাই আগ বেড়ে কথা বলতে চাইত। সদ্য শেখা বুলি দিয়ে আমাদের 'গিনিপিগ' বানানো যায় কি না তারই রিহার্সাল চালাত হয়তো।

প্রশিক্ষণ যতই সমাপ্তির দিকে গড়াতে লাগল, পাতি যাজকদের বোলচালের ধরন পাল্টাতে লাগল। তাদের ভাবভঙ্গিতে বেশ আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরুতে শুরু করল। মুখের ভাষা আক্রমণাত্মক ও শাণিত হয়ে উঠল।

আমরা দোকানিরা তাদের সাথে কথায় পেরে উঠতাম না। ফলে তাদের স্পর্ধা দিন দিন লাগামছাড়া হতে লাগল। এক তরুণ যাজক কথা নেই,

বার্তা নেই, দুম করে বলে বসল :
-মুহাম্মাদ নারীলোভী ছিল। সেজন্যেই গন্ডাখানেক বিয়ে করেছে। নাউযুবিল্লাহ!
আরেক বেটা বলল :
-ইসলাম তো তলোয়ারের জোরেই প্রচারিত হয়েছে। আমাদের খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়েছে ভালোবাসা-সেবা আর ক্ষমার মাধ্যমে।

আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মাথার চুল ছিঁড়ছিলাম অসহায় আবেগে। নিজের ধর্ম সম্পর্কে তো আমি কিছুই জানি না! আর ওরা আমার সে না জানার সুযোগ নিয়ে যা-তা বলে পার পেয়ে যাবে! সারাক্ষণ চিন্তাটা মাথার মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুরপাক থেকে লাগল।

কাটা ঘায়ে নুন ছিটানোর মতো পরদিন আরেকজন এসে মুখের ওপরই বলে দিল,
-মুহাম্মাদ তো ইহুদী-নাসারাদের কাছেই কিতাব শিখেছে। সেটাকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে।

আমার তখন মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করতে পারছি না। মুখে একটা বোকা হাসি ফুটিয়ে তাদের কথা শুনি। গাঁইগুঁই করে তো কাজ হবে না। তাদের সাথে লড়তে হলে চাই যুক্তি। চাই তথ্য। একবার ভাবলাম পালিয়ে যাই। এখানে থাকলে হয় আমাকে খ্রিষ্টান হতে হবে, না হয় আমাকে পাগল হয়ে যেতে হবে। চাকরির মন্দার বাজারে, এমন লোভনীয় চাকরি ছাড়লে ফিরে পাওয়া যাবে না। এ চিন্তা বাদ দিলাম। ভেতরে ভেতরে বিভিন্ন বিষয়ে জানার আগ্রহ তুঙ্গে। খ্রিস্টানদের খোঁচাখুঁচিতে যেন জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছিল। কিন্তু এসব বিষয়ে কোথায় পড়ব। কার কাছে পড়ব?

***

সাপ্তাহিক এক ছুটির দিনে, মালিকের গোডাউনে একটা কাজে গেলাম। ওখানে বেশ কিছু বইপত্তর রাখা ছিল। পড়ার কিছু পাই কি না সে আশায় কাগজপত্রের দঙ্গল-স্তূপের মধ্যে খুঁজতে শুরু করলাম। কী খুঁজছিলাম নিজেও জানতাম না। পড়ুয়া মানুষ ছিলাম। ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা না করলেও, নিয়মিত পড়ার অভ্যেস ঠিকই 'জীবিত' ছিল। মনের মধ্যে হয়তো পড়ার নতুন কিছু পাওয়ার কামনাও জেগে থাকতে পারে।

কাগজের ঢিবি ঘাঁটতে গিয়ে নিচের দিকে, উইয়ে খাওয়া, পোকায় কাটা একটা শতচ্ছিন্ন বই হাতে উঠে এল। মলাটে লেখা : 'ইযহারুল হক'। অর্থটা বুঝলাম না। নিচেই ইংরেজিতে নামের অর্থের ওপর চোখ গেল। এবার বুঝতে পারলাম। বইটা ১৯১৫ সালে ভারত থেকে ছাপা হয়েছে। আমার চেয়ে তিন বছরের বড় বইটা। আমি তো ১৯১৮ তে।

বইটা হাতে পেয়ে আমার জীবন বদলে গেল। পেশা বদলে গেল। লক্ষ্য আমূল বদলে গেল। বদলে গেল ইতিহাস। শুরু হলো প্রতিআক্রমণ। শুরু হলো প্রত্যুত্তর। পাল্টা আঘাত। আফ্রিকা থেকে শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল লন্ডনে। নিউইয়র্কে। সারা বিশ্বে।

আর হ্যাঁ, যাজকদের দোকানে আসা সেই কবে বন্ধ হয়ে গেছে। পরের দিকে তারা আমাকে দেখলেই ভিন্ন পথ ধরত। দোকানের বিক্রিবাট্টা কমে গেলেও, আখিরাতের পুঁজিপাতি বেড়ে যাওয়াতে কোনো আফসোস রইল না। থাকবে কেন?

জীবন জাগার গল্প : ৬৪২

পান-কাহিনি

এক.

পান খাওয়া একটা আর্ট। উপমহাদেশের গরিবের বিলাসী আয়েশ। বনেদি বড়লোকদের কারও কারও মধ্যেও পানবিলাস আছে। আমাদের জাতীয় কবিকে একবাটা পান দিয়ে বসিয়ে দিলে আর দেখতে হতো না! পানের রসের সাথে সাথে বেরুতে থাকত গানের পর গান। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এভাবে তার কাছ থেকে বহু গান বাগিয়ে নিয়েছে।

***

পান খাওয়া কাকে বেশি মানায়? নারী না পুরুষকে? আমরা একবার বিষয়টা নিয়ে ঘরোয়া বিতর্কের আয়োজন করেছিলাম। বেশ মজার এক বিতর্ক হয়েছিল। অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব যুক্তি উঠে এসেছিল পক্ষে-বিপক্ষে। শেষ দিকে অবশ্য পানের চেয়ে লাল ঠোঁট নিয়েই বিতর্ক বেশি জমে উঠেছিল।

দুই.

এশার পর পুরো কামরা সুনসান। সবই পড়ছে। কেউ কেউ গুনগুন করে বন্ধুর সাথে কথা বলছে। সবাই নিচু গ্রামেই আওয়াজ করছে। পরদিন *সুল্লামুল উলূম* কিতাবের কঠিন পড়ায় মগ্ন। জাঁদরেল ডাকসাইটে বাঘ 'আইয়ুব সাহেব হুযুর'-এর পড়া শিখছি। সামনের পড়াটাও ঠিক করে রাখছি। পড়া না পারলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবেন। তটস্থ অবস্থা। রাতের মধ্যেই পড়াটা 'পেড়ে' ফেলতে হবে। পাশাপাশি কানটাও খোলা। কিছু একটার জন্যে তৃষ্ণার্ত-চাতক-প্রতীক্ষা। উৎকর্ণ। দশটার কিছু আগেই সাধারণত ঘটনাটা ঘটে।

***

সময়ের খুব বেশি হেরফের ঘটে না। আজও ঘটল না। ঘড়ির কাঁটা তখন ন'টা পঁয়তাল্লিশের ঘর পেরিয়েছে। দরজা খুলে গেল, সাথে সাথে গুঞ্জরিত হলো,

পান খায়ে সাঁইয়া হামারো
সম্ভালি সূরতিয়া হোঁট লাল লাল
হায় হায় মলমল কা কুর্তা
মলমল কে কুর্তে পে ছিট লাল লাল!

আমাদের কামরার মহম্মদ রফি ছিল খুরশিদ (ছদ্মনাম অবশ্যই)। মায়ানমারের রসিক পানসেবী। জীবনে বহু পানখোর দেখেছি, লেকিন ওইসা কভি নেহি!। মানুষ তো পান খায়। আমাদের মনে হতো খুরশিদ পান নয়, যেন মান্না-সালওয়া খাচ্ছে। সবাই পিচিক করে পানের পিক ফেলে দেয়, সে ফেলত না। তার সোজাসাপ্টা বক্তব্য :

-পিক ফেলব তো পান খাওয়া কেন? পিক না গিললে কি নেশা জমে? পানের পিক হলো শারাবান তাহুরা। বলবাড়িষ্ঠাসিক সালসা!

সে পান তো খেতই, সাথে সাথে পানবিষয়ক অসংখ্য গান-কবিতা, শের-আশআরও মুখস্থ করেছিল। আড্ডায় বসলে সে তার 'পানবাহার' খুলে বসত। তার বেশি প্রিয় ছিল 'পান খায়ী'-টা। প্রতিদিনই দিনের শেষ খিলি মুখে দিয়ে পানের জারক রসে আপ্লুত হয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রুমে ফিরত। প্রতিটি লাইনকে সে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে গাইত। ছুটির দিনে মন ভালো থাকলে সে নাচসহই পরিবেশন করত। ঠিক যেন 'জীবন্ত পুরুষ ওয়াহিদা রেহমান'। তার কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা হাসতে হাসতে এ ওর

গায়ে ভেঙে পড়তাম। খুরশিদ নির্বিকার! নেচে গেয়ে 'পান-উপাসনা' করছে!

তৃতীয় লাইনটাকে একটু এদিক-সেদিক করে গাইত,

হায় হায় টেট্রন কা কুর্তা
টেট্রন কে কুর্তে পে ছিট লাল লাল

খুরশিদ সস্তা টেট্রন-পলিস্তারের 'কুর্তা' গায়ে দিত। বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে কুর্তার ওপর কিছুটা পিকের লাল ছিটাও ছিটিয়ে দিত। গাওয়ার সময় পুরো মুদ্রার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিত কীভাবে পান বানাতে হয়। নাচটা শিখেছিল সে 'আরেকজন'কে দেখে দেখে!

রাত দশটায় হোস্টেলের দরজা বন্ধ হয়ে যেত। আর বেরুবার উপায় ছিল না। আগে জানতাম মদের নেশা চাপে। হিরোইনের নেশা চাপে। কিন্তু পানেরও যে দুর্দম দুর্নিবার নেশা চাপে সেটা জানা ছিল না। সেই প্রথম দেখলাম।

***

এক গভীর রাতে খুরশিদের পানের 'টক' উঠল। এখন উপায়? চুপি চুপি পাশের জনকে ডেকে তুলল। সেও খুরশিদের পান-স্যাঙাত। তার কাছে তালিম নিচ্ছে পান-উপাসনার। তার এখন 'জর্দাচেনা' পর্ব চলছে। কোন জর্দার কী নাম। কেমন স্বাদ।

তাদের দুজনের অনুচ্চ ফিসফিসও নিঝুম রাতে সুউচ্চ হয়ে কানের সোনার সিস্টেমে ধরা পড়ল। চোখ খুলতেই দেখলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুজন কথা বলছে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আলগোছে ছিটকিনি খুলে বাইরে গেল। গোয়েন্দা মন টিকটিক করে উঠল। চোখ ঠেরে বলল :

-ওরে! তাড়াতাড়ি পিছু নে, না হলে কিছু একটা মিস করে ফেলবি।

তড়াক করে উঠেই চুপিচুপি পিছু নিলাম। ওরা দুজন চলতে চলতে মাদরাসার পূর্ব কোণের সীমানা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। দূর থেকে তাদের ভাবগতি বুঝতে পারছিলাম না। একটা নারকেল গাছ আছে দেয়ালের কাছটিতে। খুরশিদ প্রথমে ওটায় চড়তে শুরু করল। আচ্ছা! নারকেল চুরি হচ্ছে! না, এবার স্যাঙাতও চড়তে শুরু করল। গাছ থেকে টপকে দেয়ালের ওপাশে নামল। মাদরাসার বাইরে।

কিছুক্ষণ বোবার মতো দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলাম। দেয়াল টপকানোর সাহস হলো না। ফজরে উঠে দেখলাম দুই পানসাধক তখনো লাপাত্তা। ব্যাপার কী? রাতে ফিরতে পারেনি? নাকি দেয়াল টপকাতে গিয়ে বেঘোরে হাত-পা ভেঙেছে!

নামায পড়ে বের হলাম। শাহী গেইটের কাছে বড়সড় জটলা। কাছে গেলাম। শুনলাম রাতে দুজন চোর ধরা পড়েছে। মাদরাসার কয়েদখানায় আটকে রাখা হয়েছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, ওরা নয় তো! কাছে গিয়ে দেখি, অনুমান সত্যি! খুরশিদ কয়েদখানায় বসে তখনো নির্বিকারচিত্তে পান চিবুচ্ছে। আর পানস্যাঙাত বেজার মুখে বসে আছে।

আমরা কামরার সবাই গিয়ে অনেক বলে-কয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম। কামরায় এসেই চেপে ধরলাম,
-পানগুরু! ঝেড়ে কাশো দেখি চাঁদু!
-আর বলিস না! রাতে ভীষণ পানের টক উঠল। প্রতিরাতে বাড়তি কয়েক খিলি প্যাকেট করে নিয়ে আসি। কাল আনা হয়নি। বাইরে গেলাম পান খেতে। দুঃসাহসিক অভিযান। রেলস্টেশনে গেলাম। দোকান বন্ধ। ডাকবাংলা গেলাম, সব বন্ধ। থানার দুয়ারে গেলাম। মদীনা হোটেলের সামনের দোকানটাও তখন প্রায় বন্ধ হবে হবে করছে। দৌড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ওখানে দাঁড়িয়েই ডবলখিলি সাঁটালাম। দশ খিলি বাড়তি পকেটে পুরে রওনা দিলাম।

সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। আমি গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেছি, শিষ্য তখনো ওপারে। টেনে তুললাম। লাফ দিয়ে নামলাম। ওটাই ভুল হয়ে গেছে। দুপ করে আওয়াজ হলো। ভাগ্য খারাপ। দারোয়ান তোতা মিঞা তখন ওই এলাকায় টহল দিচ্ছিল। আওয়াজ শুনে তিন ব্যাটারি লাইট মারল। আর যায় কোথায়! আমি দৌড়ে পালাতে পারতাম। কিন্তু শিষ্যটা আলোর ঝলকানিতে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। কী আর করা, ওর জন্যে আমিও আটকা পড়লাম।

আহা! হামনে মাঙায়ী সুরমেদানী
লে আয়ি জালিম বেনারস কা জর্দা!

একরাত কারাবাস করে আমাদের 'পানগাজী' আরও পান-রসিক হয়ে উঠল। প্রতি রাতেই তার সুর ঝংকৃত হতো,
= পান খায়ে সাঁইয়া হামারো.......

***

এ তো গেল একদিনের ঘটনা। পান নিয়ে এমন হাজারো পানাহার আছে। পান-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুরশিদের কিছু গবেষণা আছে।

(ক) কোন পান বেশি মিষ্টি, গোড়ার, মধ্যের নাকি আগার? কোন এলাকার পান, মহেশখালীর নাকি অন্য কোনো জায়গার পান বেশি মিষ্টি?

(খ) সুপুরির প্রকার নিয়েও আছে। পানিতে মদানো-গ্যাঁজানো সুপুরির স্বাদ বেশি নাকি শুকনোটার? শুকনোটার মধ্যেও সেদ্ধ করা সুপুরি নাকি সাধারণটা?

(গ) পানের পিক ফেলা হবে কি না, ফেললে ক'বার?

(ঘ) দিনে কয় খিলি মারতে হবে? কতক্ষণ পর পর?

(ঙ) কীভাবে পান খেলে ঠোঁট বেশি লাল হবে?

(চ) পান খাইয়ে কীভাবে 'ইয়ে'-কে বশ করা যায়! এটা ছিল খুরশিদ'স এক্সক্লুসিভ ওয়ান!

পানবিষয়ক আরও কিছু 'অফ দ্য রেকর্ড' বিষয় খুরশিদের ট্যাঁকে ছিল। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বের হতো সেগুলো। দুর্লভ মুক্তোর মতো। মাদরাসা ছুটির আগের রাতের আড্ডায়, পরীক্ষার শেষদিন বিকেলেই সাধারণত তার কাছ থেকে আমরা এসব দক্ষিণা পেতাম।

এমনিতেই মাদরাসাজীবনে আমাদের আনন্দের উপকরণের কোনো অভাব ছিল না। তার ওপর খুরশিদের মতো যদি জীবন্ত 'পান খায়ে সাঁইয়া'-ধর্মী আনন্দ-বোমা সাথে থাকে, আর কিছু লাগে!

***

খুরশিদের রেওয়ায়েত করা একটা পান-ঘটনা বলে শেষ করি।

-(ওয়া বিহি ক্বালা হাদ্দাসানা খুরশিদ): আমাদের এক পাড়াতো ভাইয়ের বিয়ে। দাওয়াত পেলাম। পান পরিবেশনের দায়িত্ব যথারীতি আমার কাঁধেই বর্তায়। সব কাজ শেষ। দুলাকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে।

আমরা ভীষণ উত্তেজিত। এখনকার বোকাসোকা বরগুলো তো বাসরে যাওয়ার আগে 'রেড বুল' খায়। ভাবে তারাও 'বুল' হয়ে উঠবে! যত্তসব রাবিশ! আরে, ভালো করে একখিলি পান খেয়ে যা! আর কিছুই লাগবে না। এতেই 'বুল' বাবা ফুল হয়ে উঠবে। বদ্দাকে বললাম :

-খুইল্যা (সেজো ভাই)! একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। এক খিলি বিশেষ ফর্মুলায় পান বানিয়ে দিচ্ছি! দেখবেন কোন ফাঁকে রাত কেটে গেছে টেরও পাবেন না।

-ঠিক আছে দে!

আমরা পান খাইয়ে বদ্দাকে ঠেলে ঠেসে 'সোহাগরাত'-রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। বদ্দা লাল ঠোঁটে, চকচকে চোখে চলে গেলেন। আমরা হঠাৎ একা হয়ে গেলাম। পাঁচ মিনিটও যায়নি, ভেতর বাড়ি থেকে হইচই শোনা গেল। কী হলো! কী হলো! দৌড়ে গেলাম। দুলা নাকি বেহুঁশ হয়ে গেছে। প্রথমে মাথা চক্কর দিয়েছিল, বড় বড় ঢেকুর উঠতে শুরু করেছিল। একপর্যায়ে বমি করে নেতিয়ে পড়েছে। দেখলাম, বেহুঁশ হয়নি। অর্ধচেতন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। আসলে পানটা উত্তেজনার মধ্যে হজম করতে পারেনি। নতুন বউ অল্প সময়েই স্বামীর প্রেমে কুঁই কুঁই করে কাঁদছে। রব উঠল :

-দুলাকে পান কে খাইয়েছে?

-খুরশিদ্যে!

-খুইশ্যা হড়ে, ইতেরে দরি আন!

দেখলাম, অবস্থা বেগতিক। এক দৌড়ে পালিয়ে এলাম। একমাস আর বাড়িমুখো হইনি! পান-চিকিৎসা বন্ধ!

***

একটা পানীয় বাণী পড়ে বিদায় নিই :

-পান আর নারীতে কোনো পার্থক্য নেই। পান কোমল, নারীও কোমল। পান বরজের মধ্যে মাচানের আড়ালে থাকে, নারীও পর্দার মধ্যে থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে পান সূর্যের আলোয় নষ্ট হয়ে যায়, পর্দাহীন নারীও পুরুষের কুদৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে পড়ে বা পুরুষকে নষ্ট হতে সহায়তা করে। এছাড়াও পান আর নারীর মধ্যে বড় একটা মিল আছে...(সেন্সরড)। (আও কামা কালা...)।

-বিশিষ্ট পান-দার্শনিক খুরশিদ।

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৩

বাবার আক্ষেপ

ড. আবদুল হামীদ কুযাত। একজন গবেষক। জীবনস্মৃতিনির্ভর একটা বই লিখেছেন। *কাওয়াতিরু মুতাফাররিকা*। বিক্ষিপ্ত চিন্তা। একটা গল্প বলেছেন বইটাতে। তার এক সহপাঠীর বাবার গল্প।

-বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। প্রচণ্ড রাগী। বদমেজাজি বলতে যা বোঝায় তা নন। অনিয়ম দেখলেই শুধু তার রাগ চড়ত। ছাত্র তো বটেই, সহকর্মী শিক্ষকদের উল্টাপাল্টা আচরণও তার কাছে সহ্য হতো না।

আব্বুর নাম সায়ীদ জামআন। স্কুলের গেইট দিয়ে প্রবেশ করার সাথে সাথেই পুরো স্কুল শান্ত। এমনকি টিচারদের কমনরুম পর্যন্ত সুনসান। দপ্তরি বসা থেকে দাঁড়িয়ে যেত। মালী দৌড়ে ঝুরঝুরি হাতে পানি দিতে ছুটত। একটা বেত যেন তার সাথেই হরবকত থাকত। প্রয়োজনের সময় কোত্থেকে যেন একট বেত তার হাতে ঠিকই চলে আসত। আস্তিনের তলায় নাকি কোমরে গোঁজা থাকত, আল্লাহ মালুম!

জাঁদরেল শিক্ষকজীবন কাটিয়ে আব্বু অবসর গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর আম্মা মারা গেলেন। আব্বু হয়ে গেলেন একা। নিঃসঙ্গ। দিন দিন কেমন মিইয়ে যেতে লাগলেন। সারাক্ষণ গুম হয়ে কী যেন ভাবেন।

আমরা চার ভাই। একসাথেই থাকি। চার পুত্রবধূ পালাক্রমে বাবার সেবাযত্নে ঘাটতি হতে দেয় না। ছেলেবেলায় কঠোর শাসনের ফলে বাবার সাথে তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। তাই বলে বাবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার ঘাটতি নেই। অবশ্য বউমাদের সাথে তার সম্পর্ক বেশ মধুর। কন্যা না থাকায় তাদের তিনি পুরোপুরি কন্যার মতোই দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

***

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। বউয়ের মাধ্যমেই আমরা বাবার সাথে যোগাযোগ রাখতাম। একেবারেই যে তার সামনাসামনি হতাম না এমনও নয়। রুটিনমাফিক দিনে দুয়েকবার তার খোঁজ-খবর তো নিতামই। তবুও বাবা কেন যেন খুব তাড়াতাড়িই বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আরও গুটিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু একটা নিয়ে তিনি গভীর ভাবনার অতলে ডুবে যাচ্ছিলেন। বিষয়টা অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায়নি। অপ্রত্যাশিত

এক ঘটনায় এতদিনের রহস্য ফাঁস হলো। একদিন রাতের বেলা অফিস থেকে ফিরলে স্ত্রী আমাকে একটা চিঠি দিল। মুখবন্ধ।

-কার চিঠি?

-তোমার আব্বুর!

-আব্বুর চিঠি?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এক ঘরে থাকি। একসাথে খাই! এটা একটা অভাবনীয় ঘটনা? স্ত্রী কৌতূহলে ফেটে পড়ছিল। কী লিখেছেন আব্বু? জমা-জমির উইল? দানপত্র? উঁহু.. না। দ্রুত হাতে খুলে ফেললাম।

বাবারা!

প্রথমেই তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি! আমি ছেলেবেলায় তোমাদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা করে ফেলেছি। স্বভাবদোষ বলতে পার। এটা বেশির ভাগ সময় মানুষকে ভুল পথে চালিত করে।

কঠোর ছিলাম মানে এই নয়, আমি তোমদের ভালোবাসতাম না। আল্লাহর কসম! তোমরা ছিলে আমার কাছে, নিজের চেয়েও হাজার গুণ বেশি দামি। তোমাদের ছেলেবেলায় একটা কথা স্বতঃসিদ্ধ ছিল : 'একমাত্র কঠোর পিতারাই সন্তানদের মানুষ করতে পারে। নরম পিতার সন্তানরা কিছুই হয় না।' আমিও সেই আপ্তবাক্যতেই বিশ্বাসী ছিলাম। আমি মনে করতাম, এ পন্থা অবলম্বন করলেই তোমাদের ভবিষ্যৎ বেশি উজ্জ্বল হবে। তোমাদের দেখি, সন্তানদের সাথে কী অনায়াসে হাসাহাসি করছ, খেলাধুলা করছ! কাঁধে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! ঘোড়া হয়ে ঘর দাপিয়ে বেড়াচ্ছ! ছুটির দিনে তাদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছ! এটা সেটা কিনে আনছ! তাদের বায়না মেটাচ্ছ! গভীর মমতায় চুমু দিচ্ছ! তোমাদের আচরণ আমাকে যেন বিদ্রূপ করে বলে, দেখো, সন্তানকে এভাবে ভালোবাসতে হয়। এভাবে গড়ে তুলতে হয়। এভাবে আদর করতে হয়। এভাবে বড় করতে হয়! একজন বাবাকে এমন দয়ালু আর বন্ধুসুলভ হতে হয়।

বাবারা,

বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের তখনো ভালোবাসতাম। এখনো ভালোবাসি। আগের মতোই ভালোবাসি। বরং আর বেশিই ভালোবাসি। জানি না, তোমরা সত্যি সত্যি আমার প্রতি কোনো ঘৃণা বা আক্রোশ পুষে রাখো কি না? তাই যদি হয় বাছারা, আমাকে ক্ষমা কোরো। চাইলে আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে ছেলেবেলার প্রতিশোধও নিতে পার!

চার ছেলেই বাবার চিঠি পড়ে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ল। পরামর্শ করে চার ভাই একসাথে বাবার কাছে গেল। বাবার হাতে চুমু দিয়ে, পায়ের কাছটিতে বসে বলল :

-আব্বু! আমাদের সম্পর্কে আপনার মনে একটা ভিন্নধর্মী চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। এটা আমাদের অমনোযোগ আর অবহেলার কারণেই হয়েছে। আমাদের উচিত ছিল, আপনাকে আরও বেশি সময় দেয়া। আপনার অবসর-পরবর্তী সময়টাকে ভরাট করে রাখা। আমরা তা করিনি। আপনি আমাদের যেভাবে শাসন করেছেন, তার সামান্যতম ব্যতিক্রম হলেও, আমরা চার ভাই আজ জীবনে এতটা সফল হতে পারতাম কি না সন্দেহ। আপনার সুশৃঙ্খল জীবনযাপন আমাদের আজও, এই চুলে পাক ধরা বয়েসেও প্রেরণা জোগায়। আপনার লাঠির প্রতিটি বাড়ি, আমাদের জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার শক্তি অর্জনে সহযোগিতা করেছে।
তবে আব্বু! এটাও ঠিক, আমদের সময় আর এখনকার সময়ে অনেক তফাত। দুস্তর ফারাক। তাই আপনার নাতিদের প্রতিও আমাদের আচরণ কিছুটা ভিন্ন হয়েছে। এটা যুগের পরিবর্তন আর কালের চাহিদার কারণেই হয়েছে।

আব্বু আমাদের কথা শুনে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চার ভাই মিলে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। আম্মুর ইন্তেকালের পর, এই প্রথম আমাদের ভাইদের কান্না। কিন্তু আব্বুর সাথে, তাকে আঁকড়ে ধরে, জীবনের এই প্রথম কান্না! কাঁদার পর আব্বু অনেকটা শান্ত হলেন। স্মিতহাসিতে বিদায় দিলেন। আমি রুমে এসে, তাঁর মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠালাম।

প্রিয় আব্বু!
ভাইয়াদের সামনে আমি কয়েকটা কথা লজ্জায় বলতে পারিনি। আবার আপনার সামনাসামনি বলতেও লজ্জা লাগবে, তাই আপনার পথেই আমাকে এগুতে হলো।
আপনার কাছে মনে হয়েছে, আমরা সন্তানদের আদর করার ছলে, আপনাকে শেখাতে চাইছি। না আব্বু না, আপনার চিন্তাটা সঠিক দিকে গড়ায়নি। আব্বু এখনো কি হতে পারে না! আপনি জীবনে কখনো আদর করে চুমু এঁকে দেননি আমাদের কপালে। আমরা নিজের ছেলেকে চুমু দিয়ে বোঝাতে চাই, 'আব্বু! আপনিও আমাদের এখন আদর করে চুমু দিন। বুড়ো হয়েছি তো কী হয়েছে?'

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৪

ভুল বোঝাবুঝি

এক.

অনেক চেষ্টা করে একেবারে পেছন দিকের আসন পেয়েছি। পুরো রাস্তা ঝাঁকি খেতে খেতে যেতে হবে, একথা ভাবতেই হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। পুরো রাস্তা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাব, এই চিন্তায় রাতের রুটিন ভেঙে অনেকক্ষণ বই পড়া হয়েছে। সব ভেস্তে গেল। তবে সময়টা যেমন নীরস কাটবে বলে ভেবেছিলাম, তেমন হলো না। বেশ সরস আর সরব সময়ই কাটল পুরো রাস্তা। একদম শেষের সারিতে, যাকে কাউন্টারের লোকজন 'জাপান লাইন' বলে, সেখানে এসে বসলেন এক বিশাল বপু মহিলা। সমানে মুখ চলছে। শুধু খাওয়া নয়, কওয়াও। নিজের মনে কথা বলেই যাচ্ছেন। নিজের ভাগ্যকে গালি দিয়ে যাচ্ছেন, এমন বিদঘুটে আসন পাওয়ার কারণে। একটু পরপরই একটা নাম বেশ জোরে উচ্চারণ করছেন,

-ও রকি! ও রকি! তুই এক্কানা হিঁছে আয়!

প্রথমে বিষয়টা বুঝতে পারিনি। পরে বুঝতে পারলাম, বাসের সামনের দিকে মহিলার ছেলে আছে। তাকে ডাকছেন। ছেলেও কম যায় না, কানে হেডফোন ঠেসে কিছু একটা শুনছে। মায়ের ডাক শোনার সময় তার কোথায়! মা তাকে ডাকছে পেছনে এসে বসতে আর মাকে একটু আগে বসতে দিতে। কিন্তু ছেলের এদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে আছে তার মতো করে। বিষয়টা দেখে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এ যে অবিশ্বাস্য! মদ্দা ছেলে, সামনের আরামদায়ক আসনে বসে প্রায় বৃদ্ধা মাকে পাঠিয়েছে পেছনে বসতে! এমন ছেলেও থাকতে পারে? এমন সন্তান থাকতে পারে! কী ভয়ংকর ব্যাপার! কোন দুনিয়াতে আছি! ভাবনাগুলো এভাবেই মাথায় অন্ধিসন্ধিতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। অর্ধেক পথ আসার পর চমকে উঠলাম। মায়ের ডাক শুনে বা অন্য কোনো কারণে, ছেলেটা পেছনে এল। মহিলা এবার দ্বিগুন উৎসাহে বলতে শুরু করলেন :

-আমাকে সামনে বসতে দে! তুই পেছনে এসে বস!

-মা, তোমাকে আগেই বলেছি! তুমি ওখানে বসতে পারবে না। আমি কোনোমতে বসে আছি! ওখানে বসলে তুমি আরও বেশি কষ্ট পাবে!

আসলেই তাই! ভীড়ের কারণে ছেলেটা বসেছে দরজার পাশে হেলপার বসার সংকীর্ণ আসনে। মহিলা ওখানে বসা তো দূরের কথা, ঢুকতেই পারবেন না। মনে মনে ভীষণ লজ্জিত হলাম। না জেনে, যাচাই না করে, চট করে একজন সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে ফেলা, খুবই খারাপ একটা মানসিকতা।

দুই.

আরেক দিনের কথা! এইবার অবশ্য আমিই 'ভিক্টিম'! সেদিনও যাত্রীদের ভীষণ ভিড়। টিকেট পাওয়া যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে একটা ফেরত টিকেট পাওয়া গেল। অগ্রিম টিকেট ফেরত এসেছে। ভাগ্যে ওটা ছিঁড়ল! এবার অপেক্ষার পালা। বাস আসছে চলে যাচ্ছে। একটার গাড়ি আসছে তিনটায়। এভাবেই চলছে। একটা গাড়ি এল, লাইনম্যান বলল :

-একজন যাত্রী শর্ট!

অনেক ডাকাডাকি করেও কাঙ্ক্ষিত যাত্রী মিলল না। অগত্যা কাউন্টারম্যান উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ছেড়ে বলল :

-কেউ চাইলে রানিং গাড়িতে চলে যেতে পারেন!

অন্য কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি তড়াক করে লাফিয়েই ব্যাগ নিয়ে ছুট দিলাম। বাস ছুটে যাওয়া যাত্রীটার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমাকে দরজা দিয়ে উঠতে দেখেই পুরো বাসের মুখের লাগাম খুলে গেল :

-ও মালানসাব! দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন বোধ হয়!

পুরো রাস্তা সবার রোষকষায়িত দৃষ্টি আমার ওপর আছাড়ি পিছাড়ি পড়ছিল। আমি চাইলে সবার ভুল ভাঙাতে পারতাম। বলতে পারতাম :

-আমি সেই ছুটে যাওয়া যাত্রী নই! আপনারা ভুল বুঝেছেন! আমি হলাম বদলি যাত্রী।

কিন্তু চুপচাপ সহ্য করে নিলাম। কারণ, আমার মনে হয়েছে এই শাস্তি আমার পাওনা ছিল। সেদিন মা ও ছেলের প্রকৃত অবস্থা যাচাই না করেই অসুন্দর চিন্তা মাথায় গুঁজে বসে ছিলাম। প্রায়ই আত্মসমালোচনার সময় এ বিষয়টা আমাকে পীড়া দেয়। চট করে বাহ্যিক অবস্থা দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা। আলহামদু লিল্লাহ! এখন কিছুটা 'ম্যাচিউরিটি' এলেও, সমস্যাটা একেবারে দূর হয়ে যায়নি! একটা ঘটনা থেকে মানুষের বাহ্যিক অবস্থা

দেখে চট করে সিদ্ধান্ত না নেয়ার শিক্ষাটা হাসিল করার চেষ্টা করি, কিন্তু কার্যকালে কেন যে ভুলে যাই!

তিন.

খুনাইস বিন হুযাফাহ সাহমী রা.। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করা সাহাবী। দুই বার হিজরত করার অনন্য তাওফীকও তার হয়েছে। প্রথমে হাবশায় পরে মদীনায়। নিজেকে অন্যতর উচ্চতায় নিয়ে গেছেন—বদরে অংশ নিয়ে। আর ওহুদে আহত হয়ে মদীনায় ফিরে ইন্তেকাল করেছেন। স্বামী হিশেবে অবশ্যই তিনি ছিলেন প্রথম সারির। স্ত্রীও হিশেবে যাকে পেয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন প্রথম সারির; হাফসা বিনতে উমর রা.।

কন্যা বিধবা হয়ে গেল। বাবা উমর রা. কন্যার একটা ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বর্তমানে বিধবা হলে পিতারা যেমন 'কন্যাদায়গ্রস্ত' হয়ে পড়েন, দ্বিতীয়বার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সেকালে পরিস্থিতি এমন ছিল না। ছেলের মতো মেয়ের বিয়েও অবাধ আর সহজ ছিল। বিধবা সধবা সবার।

উমর রা. বড় মুখ করে উসমান রা.-এর কাছে প্রস্তাব দিলেন :
-আপনি চাইলে হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিতে পারি!
-ঠিক আছে, আমি বিষয়টা নিয়ে একটু ভেবে বলি?
-আচ্ছা!
কয়েক দিন পর উমর রা. আবার এলেন,
-কী ভাবলেন?
-আমি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছি না।

উমর রা. মনে বড় ব্যথা পেলেন। এভাবে মুখের ওপর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা! ভারাক্রান্ত মনে আবু বকর রা.-এর কাছে গেলেন। প্রস্তাব দিলেন। এবার ধাক্কাটা আগের চেয়েও শক্ত হলো। উসমান তো যাও-বা সময় নিয়েছেন। ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়েছেন। কিন্তু আবু বকর প্রস্তাব শুনে হ্যাঁ বা না, কোনো কথাই উচ্চারণ করলেন না। আবু বকরের পক্ষ থেকে এমন উপেক্ষামূলক আচরণ উমরের কাছে ছিল অবিশ্বাস্য। তবুও কী করবেন,

মনের কষ্ট মনে চেপে রইলেন। কয়েকদিন পর খোদ নবীজি হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এরপর দেখা হওয়ার পর আবু বকর বললেন :

-আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার আচরণে আপনি বেশ কষ্ট পেয়েছেন! আমি আল্লাহর রাসূলের মুখে হাফসার কথা শুনেছিলাম। আল্লাহর রাসূল হাফসাকে বিয়ে না করলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করে নিতাম!

***

উক্ত ঘটনা থেকে কিছু বিষয় ভাবনায় ধরা পড়ে :

(ক) সাহাবীদের মধ্যে, নবীজির মন-মেজায সবচেয়ে বেশি বুঝতেন কে? নিঃসন্দেহে 'আবু বকর' রা.। তিনি নবীজির মুখে 'হাফসার' নাম শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, কিছু একটা ঘটবে। ওস্তাদের মন-মানসিকতাকে গভীরভাবে বোঝাও একজন ছাত্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। অবশ্য বর্তমানের আর্থিক লেনদেনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষজন 'ওস্তাদ-শাগরিদের' সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সেটা কীভাবে বুঝবে? তাসাউফের পরিভাষায় একটা শব্দ ব্যবহৃত হয়; 'ফানা ফিশ-শায়খ'। অর্থাৎ শায়খের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়া। তার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে অবধারিত করে নেয়া। মোটকথা, ওস্তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক না হলে, ইলমে বরকত আসে না। আবু বকর রা. নবীজির সাথে গভীরভাবে মিশে যাওয়ার কারণে, নবীজির একটা উচ্চারণ থেকেও 'অনেক বড় আওয়াজ' বের করে ফেলতে পারতেন।

(খ) প্রস্তাব পাওয়ার পর, আবু বকর চুপ করে ছিলেন। উমরের কাছে কিছু ভাঙেননি। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন :

-আমি চাইনি নবীজির গোপন বিষয় প্রকাশ করতে!

কত সতর্কতা! কত আদব! না হলে তিনি আবু বকর কেন? সিদ্দীক কেন! প্রথম খলীফা কেন! হাদীসে আছে :

-মজলিসের কথাগুলো আমানতস্বরূপ! (আলমাজালিসু বিল আমানাহ)।

পেটে কথা রাখতে পারা, অনেক বড় যোগ্যতা। আমরা ভাষা শেখার একটা উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানি, ভাব প্রকাশ করা! আরেকটা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা অনেকেই বেখবর; মনের ভাব গোপন রাখা!

শুধু প্রকাশটাই যোগ্যতা নয়, ভাবকে ক্ষেত্রবিশেষে অবদমিত রাখাও অনেক বড় যোগ্যতা। আবু বকর রা. ভাষাশিক্ষার উভয় শাখাতেই সমানভাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নবীজির একান্ত মজলিসের কথা বাইরে প্রকাশ করে দেননি।

(গ) উমর রা. অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ। বলা হয়, আল্লাহর মানশা (ইচ্ছা)-এর সাথে উমরের মানশা প্রায়ই মিলে যায়। ইসলামের বেশ কয়েকটা মাসআলা এমন আছে। উমর আগে নবীজির কাছে খেয়াল পেশ করেছেন। পরে দেখা গেছে, তাঁর খেয়াল অনুসারেই ওহী নাযিল হয়েছে। হিজাবের মাসআলা তার অন্যতম নজীর।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কী হলো? তিনি উসমান ও আবু বকরের প্রতি রুষ্ট হলেন। যার চিন্তার গভীরতা এত বেশি যে, আসমানী ওহী পর্যন্ত সে গভীরতার সাথে খাপ খেয়ে যায়! সেই তিনিও সাময়িকভাবে কষ্ট পেলেন। ভুল বোঝাবুঝি হলো। মনে রাগ এল। অথচ এখানে কারোরই ভুল ছিল না। উসমান, আবু বকরও কোনো ভুল করেননি। আবার উমরও প্রাথমিক অবস্থায় মনে কষ্ট পেলেও, পরে আসল কারণ জানতে পেরে, আনন্দিত হয়েছেন। ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান ঘটেছে।

(ঘ) মানুষ বড় জ্ঞানী হয়ে গেলেও, আবেগের বিষয়টাতে অনেক সময় 'দুর্বল' হয়ে পড়েন। সাময়িকের জন্যে হলেও। আবেগের প্রথম ধাপে এমন অনেকেই 'তাড়িত' হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য শমে এসে যেতে দেরি লাগে না।

(ঙ) এমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষের মধ্যেই যদি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, আমাদের মতো সাধারণের ক্ষেত্রে তো বলাই বাহুল্য। এ জন্য আমাদের উচিত কারও সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করার আগে, বিষয়টা নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা। ভালো করে যাচাই করে নেয়া। এটাই বড় কঠিন কাজ! আমরা চট করে সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারঙ্গম!

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৫

দোয়া ও কামনা

এক.

নবীজি এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। খোঁজ-খবর করলেন। জানতে চাইলেন :

-তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো দুআ করতে?

-আমি আল্লাহর কাছে একটা দুআ করতাম, আল্লাহ! আমাকে আখেরাতে কোনো শাস্তি দেয়ার থাকলে, সেটা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন!

–সুবহানাল্লাহ! তুমি তো সহ্য করতে পারবে না! তুমি এই দুআ কেন করলে না :

=ইয়া রব! আমাদের দুনিয়াতে হাসানাহ দান করুন। আখিরাতে হাসানাহ দান করুন। আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন!

দুই.

কারও কারও মতে, কারাবাস দীর্ঘ হয়ে গেলে ইউসুফ আ. আল্লাহর কাছে বলেছিলেন :

-আল্লাহ গো, বিনা দোষে এত দীর্ঘ কারাবাস!

আল্লাহ বলেছিলেন :

-তুমিই তো বলেছিলে, রব আমার! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চেয়ে জেলখানাই আমার কাছে অধিক প্রিয়! [সূরা ইউসুফ (১২) : ৩৩]

ইউসুফ! তুমি আমার কাছে সংকট থেকে উত্তরণ চাইলে, আমি ব্যবস্থা নিতাম। তুমিই সমাধান বের করেছ। আমি তোমার বের করা সমাধানই তোমাকে দিয়েছি।

ইমাম মাওয়ারদি রহ. বলেছেন, তাকদীর অনেক সময় মুখের কথার সাথে সম্পৃক্ত হয়। আমরা ভুলবশত মাঝেমধ্যে নিজের সম্পর্কে, সন্তানদের সম্পর্কে কিছু উক্তি করে ফেলি। পরে দেখা যায়, সেটা ফলে যায়। তাই রাগের সময়, বিরক্তির সময় মুখ খোলার আগে ভেবে নেয়া উচিত!

বিপদ এলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে বা আমার কোনো গুনাহের জন্যে। দুটোই কল্যাণবহ। ইউসুফ আ.

বিপদে না পড়লে কী হতো? বাবার কোলেই বড় হতেন। মেষ চরাতেন। অহর্নিশি ভাইদের রোষের শিকার হতেন। হয়তো একসময় গোত্রীয় দ্বন্দ্বেও জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু পরিবারছাড়া হয়ে কী হলো? অনেক বিপদাপদ ডিঙিয়ে, চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে মিশরের শাসনকর্তা বনে গেলেন।

তিন.

মুসা আ. দোয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। রাব্বি! আপনি যা দেবেন তাই সই, আমি মাথা পেতে নেব। ইবরাহীম আ. আরও বেশি বুদ্ধিমান। এমন দোয়া করলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকেই তার উত্তরসূরিরূপে চেয়ে বসলেন। আল্লাহ দিয়ে দিলেন।

চার.

দোয়া করলেই আল্লাহ কবুল করেন। যা চায় তাই পায়। হুযুর জুমার দিন মসজিদে এমনটাই ওয়াজ করলেন। তবে বার বার চাইতে হবে। আর বিভিন্ন বাহানা দিয়ে চাইতে হবে। তা হলে আল্লাহ কবুল না করে পারবেন না। পেছনের কাতারে বসা, এক বেকার অলস কবির মনে কথাটা বেশ ধরল। ঘর ফিরেই জানলার ধারে বসে কবিতা লিখতে লিখতে দোয়া করল :

-আল্লাহ! এখন ফেব্রুয়ারি মাস। বইমেলা চলছে। কবিতার বইটা কেউ বের করছে না। পাণ্ডুলিপির খসড়া পড়ে আছে। উইপোকা আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। কবিতার মুসাবিদাটার এখন-তখন অবস্থা। আল্লাহ গো, বইটা ছাপানোর জন্যে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেন। আর বই কেনার জন্যও কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন!

কবি দুআ করেই যাচ্ছে। কিন্তু কবুল হচ্ছে না। শেষে তার মাথায় বুদ্ধি খেলল। হুযুর তো বলেছেন, বাহানা দিয়ে দুআ করতে! আমি আল্লাহর প্রশংসা করে একটা কবিতা লিখি না কেন? সেটা একটা বেলুনে বড় বড় করে লিখে, নিচে চাহিদামাফিক টাকার অঙ্কটা লিখে, লম্বা সুতো দিয়ে ছাদে উড়িয়ে দিই!

তাই করা হলো। প্রথম দিন গেল। কিছু হলো না। যুবক হতোদ্যম না হয়ে, দ্বিতীয় দিন আরেকটা কবিতা লিখে দিল। এভাবে পর পর কয়েকদিন। বাসার পাশেই একটা পুলিশ স্টেশন। সেখান থেকে বেলুনটা সবার চোখে পড়ল। একজন অফিসার বিষয়টাতে বেশ মজা পেলেন। তিনি উদ্যোগী

হয়ে চাঁদা তুললেন। দেখা গেল পুরো না হলেও প্রায় অর্ধেক টাকা উঠে গেছে। এক কনস্টেবলকে দিয়ে টাকাটা কবির বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। দরজা খুলে পুলিশ দেখেই কবি ভড়কে গেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল :

-আমি তো কিছু করিনি। আমাকে কেন ধরতে এসেছেন?

-না কবিসাহেব! আপনাকে ধরতে নয় ধরাতে এসেছি!

-কী ধরাতে এসেছেন?

-টাকা! টাকা!

-কিসের টাকা?

-আপনি বেলুনে টাকার কথা লিখে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন না, সেটা!

-আল্লাহ আপনাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বুঝি!

-জি!

-দিন।

পুলিশ টাকাটা হস্তান্তর করল। কবি গুণে দেখল টাকার পরিমাণ অর্ধেক। চোখমুখ গরম করে জানতে চাইল,

–কী অবস্থা! সরকারি বরাদ্দ খেতে খেতে জিহ্বা এত লম্বা হয়েছে যে এখন আল্লাহর বরাদ্দকৃত অনুদান থেকেও অর্ধেক মেরে দেয়া শুরু হয়েছে! একজন গরিব অসহায় কবির প্রতিও দয়া হলো না!

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৬

পথ-নার্সারি

শহরে চাকরি। প্রতিদিন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কর্মস্থলে যেতে হয়। এ জন্য ট্রেনে যাতায়াত করাই সুবিধাজনক! এ ছাড়া বিকল্প কোনো উপায়ও নেই। নতুন চাকরি। আগে গ্রামেই এটা সেটা টুকটাক করে খেতো!

***

যুবক প্রথম দিন ট্রেনে উঠেই অবাক। একটা দৃশ্য দেখে। তার বিপরীত পাশেই, জানালার ধার ঘেঁষে একজন বয়স্ক লোক বসে আছে! ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পর থেকেই জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিল। একজন বয়স্ক লোকের সাথে এমন ছেলেসুলভ আচরণ ঠিক যায় না। ব্যাপারটা তার চোখে পড়ল! অন্যরা তেমন গা করল না। অবশ্য তাদের প্রায় সবাই

পুরোনো যাত্রী। নিত্যদিন আসা-যাওয়া করে আসছেন। যুবকই কেবল নতুন!

এভাবে চাকরি-জীবনের প্রথম দিন চলে গেল। নতুন কর্মের নানাবিধ উত্তেজনায় বৃদ্ধের প্রতি বেশিক্ষণ মনোযোগ রইল না। পরদিনই ঠিক একই অবস্থা! বৃদ্ধ লোকটা ট্রেন ছাড়ার পরপরই মাথা বের করে দিয়েছেন। হাত নেড়ে কী যেন বাইরে ফেলছেন!

-কী ফেলছেন?

-বীজ!

-কিসের বীজ?

-ফুলের!

-এভাবে খোলা জানালা দিয়ে, চলন্ত ট্রেন থেকে বীজ ফেলে কী লাভ?

-আমিও তোমার মতো শহরে চাকরি করি। প্রতিদিন যাতায়াত করি। প্রায় ঘন্টা খানেক সময় ট্রেনে বসে থাকি! জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই! বই পড়ি! গল্প করি! এই করতে করতেই দীর্ঘদিন পার করে দিয়েছি। ভাবনা এল, এই একটা ঘন্টাকে আরও অর্থবহ করে তোলা যায় কী করে? ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা চিন্তা এল, আমি চাইলে এই একঘণ্টার পথকে সুন্দর করে তুলতে পারি! সুবাসিত করে তুলতে পারি! পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এর সুফল শুধু আমি নই, ট্রেনের সমস্ত যাত্রী ভোগ করবে!

-কী পরিকল্পনা?

-তুমি খেয়াল করেছ নিশ্চয়, আমাদের দু-পাশের পথে কোনো গাছপালা নেই। নানা আগাছা আর গুল্মে ভর্তি হয়ে আছে!

-জি লক্ষ করেছি!

-আমার ইচ্ছে, রাস্তার দু-পাশকে আমি ফুলবাগানে পরিণত করব!

-এটা একটা অসম্ভব কল্পনা!

-প্রথম প্রথম তাই মনে হবে! একটু ভেবে দেখলে, ব্যাপারটাকে আর অসম্ভব মনে হবে না!

-এত লম্বা পথে আপনি কীভাবে ফুল ফোটাবেন?

-আমাদের বাড়ির পাশে বিরাট ফুলের বাগান আছে। ওখান থেকে শহরে ফুল সরবরাহ করা হয়! কিছুদিন পর পর বাগান সাফ করে, মরা গাছগুলো ফেলে দেয়া হয়। মরা গাছের সাথে অনেক শুকনো ফুলও থাকে! আমি

অনেক দিন ধরে সেগুলো সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে আসছি! মনে মনে খেয়াল ছিল, আমিও এমন একটা বাগান করব! বীজের তো অভাব নেই! দরকার অবসর আর একখণ্ড জমি! দুটোই এতদিন মিলছিল না। ট্রেনে বসে চিন্তা করতে করতে দুটোই মিলে গেল! এবার বাস্তবায়নের পালা!

-যেভাবে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে বীজ ফেলছেন, বাতাসে সব অন্যদিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না?

-তা নিচ্ছে! কিন্তু কতদূর নেবে? দেখছ না হাত বের করে একদম নিচু করে ফেলছি! যতই উড়ে যাক, ধারেকাছেই থাকবে!

-শুধু বীজ ফেললেই হবে, পানি দিতে হবে না?

-পানির চিন্তা আমার করতে হবে না!

-কে করবে?

-এখন কোন মাস চলছে খেয়াল আছে? বর্ষাকাল চলে আসছে! বৃষ্টির পানিতেই বীজ সিক্ত হয়ে যাবে। আর রেললাইনের তলার মাটিগুলো শক্ত। ঢালু জায়গা হওয়াতে পানিও জমে থাকে না। আবার রেলপথের পাথরের ফাঁকে ফাঁকেও নানা গাছ জন্মায়, পাথরের নিচের মাটিগুলো বেশ উর্বর হয়!

-আচ্ছা, দেখা যাক! কী হয়!

***

বর্ষাকাল পেরিয়ে শুকনো মৌসুম এল। পুরো রেলপথ জুড়েই লকলকে চারাগাছ! এটা দেখে বুড়োর হাসি আর বাঁধ মানে না! দেখতে দেখতে গাছগুলোতে কলি এল! ফুলও এল! সে এক দেখার মতো দৃশ্যই বটে! মাইলের পর মাইল রাস্তার ধারে ফুল হাসছে! ট্রেনের সব যাত্রী জানালার কাছে হুমড়ি খেয়ে আছে, এই অপার্থিব সৌন্দর্য অবলোকন করার জন্যে!

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৭

দয়া ও শাস্তি

শাস্তি দিলেই অপরাধী সংশোধিত হয়ে যাবে, এই চিন্তাটা সব সময় সঠিক নয়। শাস্তি হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের পদক্ষেপ। এর আগে ক্ষমা রয়েছে। সুন্দর ভাষায় আন্তরিক ভঙ্গিতে বোঝানোর ব্যাপার রয়েছে! এসব স্তর পার হলে তবেই আসে শাস্তিপর্ব।

***

উমর রা. সদ্যনিযুক্ত এক গভর্নরকে বিদায়কালে বললেন,
-চোর ধরা পড়লে কী করবে?
-তার হাত কেটে দেব!
-যদি তাই হয়, তোমার এলাকার কোনো ক্ষুধার্ত বা বেকার আমার কাছে এলে, আমি তোমার হাত কেটে ফেলব! আল্লাহ আমাদের তার বান্দাদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। তাদের লজ্জা ঢাকার জন্যে। তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্যে! আমাদের কর্তব্য হলো সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা।

আল্লাহ তা'আলা হাত বানিয়েছেন কাজ করার জন্যে। সেই হাত আল্লাহর আনুগত্যের সীমায় কোনো কাজ না পেলে, অবাধ্যতার মাঝে কর্ম খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। পাপে লিপ্ত হওয়ার আগেই সে হাতকে তুমি আল্লাহর অনুগত্যে নিয়োজিত করে দাও।

***

কিছুদিন আগের ঘটনা। মালয়েশিয়ার এক সুপার শপ। তুমুল বেচা-বিক্রি চলছে। খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। দোকানিরা হিশেব করে কুলিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। বাড়তি লোকও নিয়োগ দিয়েও কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। গোপন ক্যামেরার মনিটরে চোখ রাখার লোকও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান দেখলেন, এক লোক বেশকিছু খুচরা গৃহস্থালি দ্রব্য নিয়ে হনহন করে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে। রক্ষী পাঠিয়ে লোকটাকে ধরে আনার ব্যবস্থা করা হলো।
-তুমি দাম না চুকিয়েই চলে যাচ্ছিলে?
-জি!
-কেন করছিলে এমনটা?
-কিছুদিন ধরে আমি বেকার জীবন কাটাচ্ছি! ঘরে বউ-বাচ্চা আছে। স্ত্রী সদ্য তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ঘরে খাবার নেই। বাচ্চারা কাঁদছে! নবজাতক দুধ পাচ্ছে না। সত্যি করে বলছি, আমার চুরি করার মোটেও ইচ্ছে ছিল না। পরে শোধ করে দেব! অপারগ হয়েই এ কাজে নেমেছি। এবারের মতো মাফ করে দিন।
সুপার শপের পরিচালক কিছু একটা চিন্তা করলেন। তারপর লোকটার সাথে দোকানের একজন প্রহরীকে দিয়ে পাঠালেন। লোকটা সত্যি বলছে কি না, যাচাই করে আসতে! সংবাদ এল, লোকটা যা বলছে সব সত্যি!

শপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মুচকি হেসে বললেন,
-ঠিক আছে, আপনি যা নিয়েছেন তা তো রইল-ই, আরও কিছু লাগলে নিতে পারেন। আর এই নিন, কিছু টাকা! প্রয়োজনে খরচ করবেন।
ঘটনাটা প্রকাশ পাওয়ার পর পুরো দেশে হইচই পড়ে গেল। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। সাংবাদিকরা ছুটে এল এমন ব্যতিক্রমী মানুষটাকে দেখতে!
-আপনি মানুষটাকে প্রথমেই পুলিশে দিলেন না কেন?
-একটা বিষয় শুরুতেই মাথায় এসেছিল। মানুষটা চুরি কেন করছে? স্বভাবদোষে নাকি অভাবে? অভাবের তাড়নায় চুরি করে থাকলে, তাকে পুলিশে দেয়াটা অন্যায় হতো না! আর যখন সত্যি ঘটনা প্রকাশ পেল, ঘরের অসহায় অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে, গৃহকর্তাকে পুলিশে দিলে, একসাথে পাঁচজন মানুষকে শাস্তি দেয়া হয়ে যেত না!
আমি এটাও ভেবেছিলাম, লোকটাকে দয়া করলে ভবিষ্যতে অনেক কাজে দেবে। মানুষটাও অন্যের উপকার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হতে পারে! এই সম্ভাবনাও মাথায় ছিল!

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৮

সামান্য পার্থক্য

১৯৭৬ সালের অলিম্পিক। মন্ট্রিলে। এক শ মিটার দৌড়ের ইভেন্ট চলছে। সবার আগে আছেন হ্যাশলে ক্রাফোর্ড; ১০.০৬। তার ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন ডোনাল্ড কুয়েরি; ১০.০৮। মাত্র এক সেকেন্ডের দশ ভাগের দুই ভাগ পার্থক্য। খুবই সামান্য ব্যবধান। অথচ ফলাফলে কত বিরাট পার্থক্য! স্বর্ণ আর রুপা। গোল্ড আর সিলভার। অর্ধেকের চেয়েও কম।

***

টেক্সাসে এক ঘোড়দৌড়-ময়দান। লাল টাট্টু ঘোড়াটা দৌড়াচ্ছে বেশ। পেছনের কালোটাও কম যাচ্ছে না। প্রায় সমানে সমান। ব্যবধান? লাল আরবী ঘোড়ার নাকটা সামান্যতম অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। বলতে গেলে এটা কোনো পার্থক্যই নয়। অথচ ফলাফলে কী আকাশ পাতাল তফাত। লাল মিয়া পেয়েছে এক মিলিয়ন ডলার। কালা মিয়া পেয়েছে মাত্র পঁচাত্তর হাজার ডলার।

***

আমরা প্রতিদিন নিয়মিত রুটিনের এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জেগে, নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে পড়া শুরু করলে সপ্তাহে সাত ঘণ্টা সময় হাতে পাব। মাসে ত্রিশ ঘণ্টা। একটা বিষয়ে ত্রিশ ঘণ্টা পড়া মানে তো হুলুস্থুল কাণ্ড! মাত্র একটা ঘণ্টা, অথচ কী অকল্পনীয় ফলাফল!

***

আমরা যদি জামাত দাঁড়ানোর কিছু আগে বা দশ মিনিট আগে মসজিদে যাই, চুপচাপ বসে না থেকে কুরআন তিলাওয়াত করি, কমপক্ষে পাঁচ থেকে দশ পৃষ্ঠা তিলাওয়াত করতে পারব। সব নামাযে না হলেও, একটা বা দুইটা নামাযেও যদি আগে আগে যাই, মাস শেষে ফলাফলটা কী দাঁড়াবে? অথচ প্রতিদিনের হিশেবে কত সামান্য!

***

বাবা অফিস থেকে ফিরেই ছেলেকে নিয়ে বসেন। আম্মু খাবার প্রস্তুত করার আগে, প্রতিদিন একটা করে ইংরেজি গল্প পড়েন। বছর শেষে দেখা গেল ছেলের ইংরেজি-জ্ঞান বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ প্রতিদিন বড়জোর বিশ মিনিট ব্যয় হয়েছে। সামান্য বিশটা মিনিট, অথচ ফলাফল কত বড়!

***

আমরা এ সামান্য 'পার্থক্য' বা সামান্য 'সংযোজন'-রীতির অনুশীলন করতে পারি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

= আমরা নিজেদের কাজে, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নিজেদের সুস্থতার ক্ষেত্রে, সন্তানদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন করতে পারি।

= আমরা খুঁজলে দেখব, জীবনে নানা বাঁকে অসংখ্য খালি জায়গা থাকে। আমরা সেগুলোতে 'পার্থক্য'-নীতি অবলম্বন করলে, জীবনটাই বদলে যেতে বাধ্য।

জীবন জাগার গল্প : ৬৪৯

মেকানিক ফোর্ড

দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ। বুক চিরে চলে গেছে সর্পিল পথ। দূরে। বহু দূরে। গাড়ি-ঘোড়া বড় একটা নেই। মাঝেমধ্যে দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। নির্জনতাকে ভেঙে খানখান করে।

***

গাড়িতে শুধু চালক। গাড়ি চালানোর ধরনে বোঝা যাচ্ছে, তার কোনো ভীষণ ব্যস্ততা আছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এমন বিপদঘন মুহূর্তেই গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। গাড়িটা এলোমেলো কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল। চালক গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলল। ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার কারণটা বের করার চেষ্টা করছে। খুটখাট করেও কোনো রাস্তা বের হলো না। ইঞ্জিনে মাথা গুঁজে পড়ে থাকতে দেখে, আরেকটা গাড়ি এসে থামল।

-কী ভাই! কোনো সাহায্য লাগবে?

-জি না, ভাই! আমি নিজেই ঠিক করে ফেলতে পারব।

***

গাড়িটা চলে গেল। বিকল গাড়ির চালক চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। কাজ হচ্ছে না। এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ সময়। দুপুর গড়িয়ে পড়ার উপক্রম। উল্টো দিক থেকে আগের সেই গাড়ি এল। ঘ্যাচ করে পাশে এসে ব্রেক কষল।

-কী ভাই, গাড়িটা কি ঠিক হলো?

-জি না।

-আমি কি একটু দেখব?

-জি, দয়া করে দেখলে খুবই উপকার হয়!

দ্বিতীয় চালক গাড়ি থেকে তড়াক করে নেমেই কাজে নেমে পড়লেন। ইঞ্জিনে হাত দিয়ে একটা তার সামান্য ছিঁড়েই আবার জোড়া লাগিয়ে দিলেন। গাড়ি আপনা-আপনি স্টার্ট হয়ে গেল। প্রথম চালক তো অবাক!

-আমি সকাল থেকে মাথাকুটেও কিছু করতে পারিনি। আপনি, মাত্র আধা মিনিটেই সারিয়ে ফেললেন?

-আপনার গাড়িটা কোন কোম্পানির?

-ফোর্ড!

-আমার নাম হেনরি ফোর্ড!
-বলছেন কী? আপনিই তা হলে এ গাড়ির আবিষ্কর্তা!
-জি। আপনি প্রথমবার আমাকে একটু সুযোগ দিলে, এতটা সময় আপনাকে রোদে পুড়তে হতো না। সময়টাও নষ্ট হতো না। আমি তো এ গাড়ির নাড়ি-নক্ষত্র সব জানি। কোথায় কী রাখা আছে, কোন যন্ত্র ফিট করা আছে, তাও আমার চোখস্থ। দেখলেই বুঝতে পারি, তার খামতি কোথায়, খুঁত কোথায়!

***

আমাদের অবস্থাও ঠিক এমনি। আমাদের স্বভাবে বা আমলে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, যদি মানবরচিত সমাধান করি অথবা নিজেই সেটার সমাধানে নেমে পড়লে, কার্যকর ফলাফল আসবে না। আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনিই আমাদের সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনিই জানেন কোন সমস্যার সমাধান কী? সে মতে তিনি একটা সমাধানও দিয়ে দিয়েছেন। উপায় বাতলে দিয়েছেন।
আমরা বান্দারা, প্রথমেই আল্লাহর দেয়া নিদান গ্রহণ না করে, মানবীয় নানা সমাধানের প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ফলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। আমরা প্রতিটি সমস্যাতে, প্রথমেই আল্লাহর দিকে পা বাড়ালে,
= অনেক সময়, মেধা ও শ্রম বেঁচে যাবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানেই কামিয়াবি আসবে।

জীবন জাগার গল্প : ৬৫০

বুড়োর দুঃস্বপ্ন

লোকটার কাজই হলো পরচর্চা করা। চা-দোকানে, পাড়ার কোণের বেঞ্চিতে বসে, মহল্লার ক্লাবে। কোনো জায়গাই বাদ নেই। কাউকে সামনে পেলেই হলো, সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় পরনিন্দা আর গীবত। মানুষ অতিষ্ঠ। রাস্তা দিয়ে তাকে হেঁটে আসতে দেখলেই হয়েছে, তড়িঘড়ি সটকে পড়ে সবাই। তার সামনে পড়লেই হয়েছে, একটা না একটা দোষ বের করে, পরে কখনো সেটার রসালো বর্ণনা দেবে। পারতপক্ষে কেউ তার ছায়াও মাড়াতে চায় না।

***

এক রাতে বুড়োটা স্বপ্নে দেখল,
= বিরাট এক ভয়ংকর দৈত্য, তার টুঁটি চেপে ধরেছে। প্রখর ধারালো নখর দিয়ে তার জিহ্বাকে টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দিচ্ছে। কাটাকুটি শেষ হলেই, জিহ্বাটা আবার আগের মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে। দৈত্যটা আবারও জিবটা খুবলে নিয়ে, নখ দিয়ে কুটতে শুরু করছে।
বিকট এক আর্তচিৎকার করে বুড়ো ঘুম থেকে জেগে উঠল। বাকি রাতটা আর ঘুম এল না। পর পর তিন রাত স্বপ্নটা দেখল।

সকালে কালবিলম্ব না করে দৌড়ে ইমাম সাহেবের কাছে গেল।
-হুযুর আমি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন! রাতে ঘুমুতে পারি না। দিনে স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করতে পারি না। মরে যাওয়ার অবস্থা!
-বিপদটা কী?
বুড়ো তার স্বপ্নের কথা খুলে বলল। হুযুর বললেন :
-আপনি কি নিয়মিত বড় ধরনের কোনো গুনাহ করেন?
-না তো! এ বুড়ো বয়েসে কি গুনাহ করার শক্তি-তাকত আছে শইলে?
-তা হলে? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। অন্যে কষ্ট পায়, এমন কিছু করেন না?
-না, তেমন কিছু তো মনে পড়ে না। তবে আমার চোখে সব সময় মানুষের দোষগুলো ধরা পড়ে!
-সেগুলো কি অন্যের কাছে বলে বেড়ান?
-জি।
-এটাই সে বড় পাপ।
-এটা পাপ হবে কেন?
-অন্য পাপ তো আল্লাহ চাইলেই ক্ষমা করবেন। এটা এমন পাপ, যার ক্ষমা পাওয়াও বেজায় কঠিন। ঠিক আছে, বিষয়টা আপনাকে বোঝাচ্ছি। বাড়িতে বালিশ আছে না?
-আছে।
-একটা বালিশ নিয়ে ছাদে উঠবেন। ছুরি দিয়ে বালিশটা কেটে, তুলাগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে আবার আসবেন।

***

-হুযুর উড়িয়েছি।
-ঠিক আছে, আবার গিয়ে তুলাগুলো কুড়িয়ে বালিশে ঢুকিয়ে ফেলুন।

-হুযুর, এটা কী করে সম্ভব? তুলাগুলো বাতাসে কোথায় কোথায় চলে গেছে, তার কোনো হদিস আছে?
-আপনার গীবতের পরিণামও এমনি। বিগত জীবনে কার কার গীবত করেছেন, তার কোনো লেখাজোখা নেই। আপনি সবার কাছে ক্ষমা চাইতে পারবেন? সবাই তুলার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েনি?
-তা হলে হুযুর, এ পাপ থেকে বাঁচার উপায়...?
-আপনার গীবত করার ইচ্ছে হলে কল্পনা করবেন, মরা ভাইয়ের কবরে নেমেছেন। সামনে ভাইয়ের গলিত ভকভকে পচা লাশ। আপনি স্বপ্নে দেখা সেই পিশাচের মতো, খুবলে খুবলে মাংস খাচ্ছেন। তা হলেই গীবতের রুচি থাকবে না।
-কিন্তু অতীতে যা করেছি?
-যাদের চেনেন, তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।
-কিন্তু অনেককে তো চিনি না। তারা মারা গেছে বা এখন কাছেপিঠে থাকে না!
-তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। পারলে তাদের নামে আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করবেন। এতে হয়তো আপনার পাপ কাটাকুটি হয়ে যেতে পারে। যদি আল্লাহ চান।

জীবন জাগার গল্প : ৬৫১

আমার বান্ধবী

মাস্তুরাত জামাতে কারগুজারি শোনা হচ্ছে। সবার শেষ। বাকি আছে একজন।
-আমি লায়লা। বয়েস চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। সবাই তো একে একে নিজের দ্বীনের পথে আসার ঘটনা বলল। চুপ করে শুনছিলাম। অভিভূত হচ্ছিলাম। আমার দ্বীনের পথে আসার ঘটনাটা জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দের ঘটনা হলেও, এর সাথে আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে।

***

যে পরিবারে আমি বেড়ে ওঠেছি সেখানে দ্বীনের লেশমাত্রও ছিল না। নাচ-গান আর উৎসব-আনন্দ নিয়েই মেতে থাকত সবাই। মা ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী। বাবা শিল্পপতি। দুজনেই প্রগতিশীল চিন্তায় বিশ্বাসী। কলেজ-লাইফে তিনিও বামচিন্তা আর নাটক-মঞ্চ নিয়েই থাকতেন। সেখানেই মা-

বাবার পরিচয়-পরিণয়। ভাইয়া-বড় আপুও ডাকসাইটে মেধাবী ছাত্র। বাবা-মায়ের আদর্শের একনিষ্ঠ সমর্থক-অনুসারী। আমিও সে পথেই পা বাড়াচ্ছিলাম। বলা ভালো একটু বেশিই সেদিকে যাচ্ছিলাম। কলেজ-লাইফ শেষ করে ভার্সিটি-জীবন শুরু হলো। খুলে গেল এক অবারিত দ্বার। কত রকমের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হলাম। নতুন নতুন চিন্তার সাথে সখ্যতা গড়ে উঠতে লাগল। সৌন্দর্যের কারণে, তুখোড় ফলাফলের সুবাদে, পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ডের খ্যাতি আর অর্থবিত্তের চাকচিক্যের জেল্লায় সবার দৃষ্টি আমার ওপরই নিবদ্ধ থাকত।

***

শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও আমার আশপাশে ঘুর ঘুর করত। কারণ, এতে অনেক সুবিধা। তাদের ছেলেবন্ধু খুঁজে পেতে সুবিধে হতো। নাটক-বিতর্কে রোল পাওয়া সহজ হতো। আমিও বিষয়টা দেখেও না দেখার ভান করতাম। কেবল একটা মেয়েকেই ব্যতিক্রম দেখতাম। আমরা সবাই যখন ফাঁকে ফাঁকে হই-হুল্লোড়ে মগ্ন, সে তখন আপনমনে কিছু একটা পড়া বা লেখা নিয়ে ব্যস্ত। সে ছিল আমাদের স্যারের মেয়ে। প্রথম প্রথম আমার প্রতি তার উপেক্ষার আচরণ দেখে, ভীষণ ক্রুদ্ধ হতাম। একদিন ক্রোধ ঝাড়তে গিয়েই তার সাথে প্রথম কথা।

***

আমাদের ফ্যাকাল্টিতে সেকশন এ-র সাথে, সেকশন বি-র বিতর্ক হবে। বলাবাহুল্য আমিই ছিলাম অঘোষিত দলনেতা। সবার কাছ থেকে চাঁদা আমিই সংগ্রহ করছিলাম। এই ছুতোয় তার কাছে গেলাম। তার সাথে কথা বলে একটা ধাক্কামতো খেলাম। এতটা মার্জিত আর সৌম্য ভঙ্গিতে কেউ কথা বলতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না। আমি তো ঘরে-বাইরে চিল্লাফাল্লা ছাড়া কথাই বলতে পারতাম না।

সে বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে না। তবে বিতর্কের মাল-মশলা সংগ্রহ করে দিতে তার আপত্তি নেই। আমি ধারণাও করতে পারিনি, সে ধার্মিক হয়েও এতটা প্রখর যুক্তির অধিকারী। তার বাতানো পয়েন্টগুলো ধরেই আমরা সেবার জিতলাম। মূল নায়ক অন্তরালেই রয়ে গেল। সবাই এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। ভাবল, এতসব তুখোড়-প্রখর আর শানানো যুক্তি আমারই উদ্ভাবিত!

***

তার কাছেই আমি প্রথমবারের মতো কালিমা শিখি। গল্পচ্ছলে সে আমাকে নামাযও শেখাল। ছোট ছোট সূরা শেখাল। এসব অবশ্য একদিনে হয়নি। অনার্সের দীর্ঘ চার বছরে হয়েছে। আমার মধ্যে সে-ই প্রথমবারের মতো কুরআন কারীম হেফয করার প্রেরণা ঢুকিয়ে দেয়। যা আমি এই চল্লিশে এসেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

আমার পরিবর্তন পরিবারের চোখে পড়ল। আম্মু প্রথম প্রথম অবাক হতেন। পরে পরে মৃদু বকাবকিও করতেন। সবাই আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকত। আমি থাকতাম আমার মতো করে। আগের মতো তাদের সাথে যোগ দিতে ভালো লাগত না।

***

অনার্স শেষ বর্ষের শেষ দিকে। একদিন স্যার আসেননি। ফাঁকা পেয়ে আমরা গল্প করছিলাম। আমাকে বলল :

-একটা পাত্র আছে। দ্বীনদার। এই তার পুরো বায়োডাটা! পছন্দ হলে জানিও!

আমি দেখলাম এটা আমার জন্যে বিরাট এক নেয়ামত। পাত্রের সবকিছু আছে। যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; দ্বীন, সেটাও আছে। ভালোভাবেই আছে। আম্মুকে জানালাম। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন।

-তাই বলে তুই একটা হুযুরকে বিয়ে করবি?

-হুযুর কোথায় দেখলে! সে তো আমার মতোই ভার্সিটি পড়ুয়া! হাইলি কোয়ালিফায়েড!

-তা হোক! ধর্মের বীজ ঢুকলেই এরা আগের পড়ালেখা সব ভুল মেরে দেয়। মৌলবাদই তাদের শিরা-উপশিরায় কিলবিল করে বেড়ায়।

***

আব্বু, ভাইয়া-আপু কেউ রাজি হলো না। আমি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলাম। এভাবে বেশিদিন থাকলে, মনে পাপচিন্তা বাসা বেঁধে বসবে। আমার চারদিকে এত লোভ। এত হাতছানি! বাইরে তো বটেই, ঘরে আরও বেশি। কত কত 'ব্রাইট' ছেলেরা আসত! আম্মুর নাট্যদলের ছেলেরা। ভাইয়ার বন্ধুরা! আব্বুর ব্যবসায়ীর পার্টনারদের উজ্জ্বল সব ছেলেরা!

বান্ধবীর সাথে পরামর্শ করলাম। সে বলল, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্যে বিয়ে তো জরুরি। আমি তোমাকে বাবা-মায়ের অমতে বিয়ে করতে পরামর্শ দেব না। আবার নিরুৎসাহিতও করব না। তুমি তোমার বুঝ-ব্যবস্থা মতো একটা কিছু সিদ্ধান্ত নাও।

***

আমি বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। পাত্রও আমার অবস্থা সব জানতে পেরে সরাসরি আব্বুর কাছে প্রস্তাব পাড়ল। বলাবাহুল্য প্রত্যাখ্যাত হলো। বান্ধবী জানাল, পাত্র বলছে, আমি রাজি থাকলে, বাবা-মায়ের অগোচরে বিয়ে করতে তার আপত্তি নেই।

আরেকটু সময় নিলাম। আম্মুকে আকারে-ইঙ্গিতে বোঝালাম, তারা রাজি না হলেও আমি বিয়েটা করে ফেলব। আম্মু ভয় পেয়ে গেলেন। খোঁচা দিয়ে বললেন :

-এত ধর্ম ধর্ম করিস! তোর ধর্ম কি তোকে প্রেম করতে বলেছে?

-আম্মু আমি কিন্তু লোকটার সাথে এখনো পর্যন্ত সরাসরি কথাও বলিনি, দেখাও করিনি। বান্ধবীর উপস্থিতিতে শুধু একবার ফোনে কথা হয়েছে। কারণ, সে বান্ধবীর বড় ভাই।

-তোর যা ইচ্ছে কর। তোর বাবা এই বিয়ে কখনোই মেনে নিতে পারবে না। আমরাও এই জামাতাকে নিয়ে 'সোসাইটিতে' মুখ দেখাতে পারব না।

***

মায়ের মৌন সম্মতিতে বিয়েটা সেরে ফেললাম। ভাইয়া-আপুকে জানিয়েছিলাম। তারা কেউ উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আমি বাড়িতেই রয়ে গেলাম। যেন কিছুই হয়নি। বাবা-মাও চুপচাপ। তবে চাপা একটা গুমোট ভাব আঁচ করছিলাম।

অর্নাস শেষ করার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক আছে। আমি যাই। তারা কেউ আসে না। এ-ই ভালো। বাবা কথাবার্তা বলেন। নাতিদের কোলে নেন। আদর করেন। তারপরও কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব আছে। আশা করছি সেটাও কেটে যাবে। মাও তো বুড়িয়ে গেছেন। আর কত সোসাইটি নিয়ে ভাববেন!

***

আর হ্যাঁ, আমার কষ্টের স্মৃতিটা বলা হয়নি। আমার বান্ধবী ও ননদ, যার উসিলায় আমি আজ এমন মুবারক জামাতে শরীক হতে পেরেছি, সে আমাদের বিয়ের কিছুদিন পর, গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল। আমার পৃথিবীটাকে একেবারে শূন্য করে দিয়ে। তার বোধহয় জানা হয়ে গিয়েছিল, তাই এত তাড়াতাড়ি বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিল।

আলহামদু লিল্লাহ। আমার তিন সন্তানের দুজন হাফেয। আরেকজন নাযেরা পড়ছে। আমিও হেফয চালিয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ শিগগিরই খতম শেষ হবে। সবার কাছে দুআ চাই

জীবন জাগার গল্প : ৬৫২

অপেক্ষমাণ জান্নাত

দেশের বাইরে যেতে হলো। তিন দিনের জন্যে। হঠাৎ করেই। এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া। তেমন করে কাউকে বলেও যেতে পারিনি। বলে যাওয়ার কথা মনেও আসেনি। তুমুল ব্যস্ততার মাঝে সময়গুলো কেটে গিয়েছিল। বিদেশ যাওয়ার আগে কয়টা দিনের। বিয়ের বয়েস তিন। বউ-বাচ্চা ছেড়ে আগে কখনো দূরে কোথাও যাওয়া হয়নি। অনভ্যস্ত বিরহে অস্থিরতায় ভুগছিলাম। বিমান থেকে নেমেই ফোন করলাম। স্ত্রীকে। তার গলার স্বর শুনতে ইচ্ছে হচ্ছিল। একমাত্র পুত্রের মুখে আব্বু ডাক শোনার পিপাসা ছিল।

***

আমার ফোন বেজেই চলল। কেউ ওঠাল না। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কী হলো? মা বা ছেলে কেউ ফোন ওঠাচ্ছে না কেন? প্রচণ্ড অস্থিরতায় প্রতি পনেরো মিনিট পর পর কল দিতে থাকলাম। যে কে সেই। এ দিকে যে কাজে এসেছিলাম সেটা সারা হলেও, মন সুস্থির না থাকায় সামান্য গড়বড় হতে গিয়েও হলো না। ভালোয় ভালোয় শেষ হলো।

বাসার কাউকে না পেয়ে আমার বোনের সাথে যোগাযোগ করলাম। তারা খোঁজ নিয়ে জানাল, সব ঠিক আছে। তা হলে ফোন ওঠাচ্ছে না কেন? আসার সময় আপন করে বিদায় জানাল! শাশুড়িকে ফোন করলাম। তিনিও জানালেন, বাসার সবাই ভালো। তবে? নানারকম অমূলক চিন্তা মাথায়

ঘুরপাক খেতে থাকল। সম্ভব-অসম্ভব কোনো চিন্তাই মাথায় আসতে বাকি থাকল না। কিন্তু সমাধান বের হলো না।

***

কাজ শেষে দেশে ফিরলাম। একপ্রকার উড়ে উড়েই বাসায় এলাম। আগ্রহের আতিশয্যে রীতিমতো দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। দরজা খুলে দিল স্বয়ং স্ত্রী। পরিপূর্ণ সুসজ্জিতা! পরিপাটি বেশভূষা! অধরে হাসির দুষ্ট ঝিলিক! ছেলেটাও কোত্থেকে উড়ে এসে আব্বু বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তিন দিনের রাগ অভিমান মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হলাম। একটু বাদেই সব মনে পড়ল। গলার ঝাঁজ মিশিয়ে জানতে চাইলাম :

-এত ফোন করলাম, ধরলে না কেন? আছ তো দিব্যি! সমস্যাটা কী হয়েছিল?

-সব বলছি! তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও!

-কী প্রশ্ন?

-যাওয়ার আগে তোমার আম্মুর সাথে দেখা করে গিয়েছিলে? বা যাওয়ার পর একবারও তাঁকে ফোন করেছিলে?

***

স্ত্রীর প্রশ্নে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তাই তো! আমার তো প্রথমেই মাকে জানানো উচিত ছিল। ব্যস্ততার কারণে জানাতে না পারলেও বিমানে বসে বা নেমে অন্তত একবার হলেও মাকে জানানো উচিত ছিল! ভুল হয়ে গেছে। বড় ভুল হয়ে গেছে। বিষয়টা আমার মাথায় কেন যে এল না? ও (স্ত্রী) তো আমার চেয়ে বয়সে ছোট! কিন্তু জ্ঞানে-চিন্তায় আমার চেয়ে বড় দেখছি! বড় শ্রদ্ধা জাগল স্ত্রীর প্রতি!

***

-শোনো! তোমাকে আগেও কয়েকবার বলেছি! মায়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা জরুরি। তুমি ভুলে যাও। তিনি তোমাকে নিয়ে কত চিন্তা করেন। তুমি বিদেশে গিয়ে যেমন আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তায় অস্থির সময় কাটিয়েছ। তোমার মা তোমাকে নিয়ে তার চেয়ে বেশি অস্থির সময় কাটিয়েছেন।

আমি ইচ্ছা করেই তোমার ফোন ওঠাইনি। তুমি একটু হাতেনাতে বোঝো। একজন অপেক্ষমাণ মানুষ কতটা অধীরতা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গোনে!

এই নাও! আমি একটা শাড়ি কিনে রেখেছি। আর আম্মু এই মিষ্টিটা পছন্দ করেন। সেটাও কিনে রেখেছি। তুমি এখুনি গিয়ে মায়ের সাথে দেখা করে এসো। পারলে বুঝিয়ে, শুনিয়ে কয়েক দিনের জন্যে নিয়ে এসো। তিনি তো নিজের ঘর ছেড়ে নড়তেই চান না।

-জারিয়া! তুমি সত্যি খুবই ভালো মেয়ে!

-হয়েছে আর তোষামোদ করতে হবে না।

-সত্যি বলছি! তুমি তো এ দিকটা খেয়াল না করলেও পারতে। অধিকাংশ মেয়েই করে না। তোমার মতো দুয়েকজন ভালো মেয়ের কাছেই এমনটা পাওয়া যায়! এ জন্যই পৃথিবীটা টিকে আছে! আচ্ছা আফনানকে সাথে নিয়ে যাই?

-না, নিয়ো না। সাথে নিয়ে গেলে, আম্মুর মূল আকর্ষণটা শেষ হয়ে যাবে। আফনান না গেলে, ওর লোভ দেখিয়ে হলেও মাকে নিয়ে আসার একটা সম্ভাবনা থাকে।

-তুমি সত্যি সত্যি ভীষণ বুদ্ধিমতী!

-আবার! তাড়াতাড়ি যাও। তোমার জান্নাত তোমার অপেক্ষায়!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৩

কন্যার দোয়া

এক মহিয়সী আরব মহিলার জীবন থেকে নেয়া ঘটনা। ঘটনা খুব বেশিদিন আগের নয়। এই তো বছর দুয়েক আগের। তিনি বলেছেন :

-আমার বিয়ে যখন হলো, আমার স্বামী ছিলেন একজন টগবগে তরুণ। প্রাণোচ্ছল যুবাপুরুষ। সবকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পান। মন খারাপ হওয়া বা বিষণ্নতা বলতে কিছুই ছিল না তার জীবনে। তার সঙ্গ পেয়ে আমার মতো গম্ভীর মেয়েও কলকলে তরুণীতে পরিণত হলাম। দুজনের সংসার সব সময় আনন্দে কলকল করত।

***

আমরা থাকতাম শহরের ছোট্ট একটি বাসায়। দু-কামরার। ছিমছাম। নির্ঝঞ্ঝাট। নিরুপদ্রব। তার চাকরিক্ষেত্র থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। অফিসের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যেত। সে জন্যই এখানে থাকা। তার বাবা-মা থাকতেন উল্টো দিকের এক গ্রামে। প্রতিসপ্তাহে দু-তিন দিন বাবা-মায়ের কাছেও রাতে থাকতে যেত। তার মতো বাবা-মা

অন্তপ্রাণ ছেলে এ যুগে বিরল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আর আন্তরিকতা দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

বুড়ো-বুড়ির যাতে কোনোপ্রকারের কষ্ট না হয় সেদিকে তার প্রখর দৃষ্টি। না পারতেই সে আমাদের নিয়ে আলাদা বাসায় থাকছে। যাতায়াত-সুবিধার কারণে। আল্লাহ আমাদের একটা কন্যা দান করলেন। এবার একটা বড় বাসা নিয়ে বাবা-মাকেও এখানে নিয়ে এল। এভাবে বিয়ের পর চার বছর কোন ফাঁকে কেটে গেল, টেরটিও পেলাম না। বিয়ের পঞ্চম বছরের মাথায়, অফিসে যাওয়ার পথে, তাদের গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ল। অনেক হতাহত হলো। আমার স্বামীর অবস্থা ভীষণ গুরুতর! আমার বৃদ্ধ শ্বশুর দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিলেন। দৌড়ঝাঁপ করে যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। অফিস থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হলো। কিন্তু আঘাতটা মাথায় লাগাতে চেতনা ঠিকমতো ফিরে আসছিল না। প্রায় অর্ধমৃত অবস্থা। হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হলো। বাড়িতে নিয়ে এলাম।

***

শুরু হলো জীবনের কঠিনতম অধ্যায়। সংসারের খরচ জোগাড় করা, স্বামীর সেবা করা, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করা। এ দিকে মেয়েটাও বড় হয়েছে। ডাক্তাররা কোনো আশাই দিল না। আমার বাড়ি থেকে চাপ দেয়া হলো, স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যেতে। আমার বয়েস কম, আবার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। পাত্রও তৈরি আছে।

আমার বিবেকে বাধা দিল। এভাবেই দিন গিয়ে মাস হলো। মাস পার হয়ে বছর ঘুরল। স্বামীর কোনো উন্নতি নেই। সেই আগের মতোই নির্জীব! নিস্পন্দ! নিথর! বাবা-মা আর কতদিন অপেক্ষা করবেন? তারা আমার অবস্থা বুঝতে পারছিলেন। এখানে যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই সেটা একটা বালকও বুঝতে পারবে। এভাবে কেটে গেল পাঁচটি বছর।

আব্বা একদিন মুফতীর ফতোয়া নিয়ে এলেন। স্বামীকে ছেড়ে যেতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। বেশ জোরাজুরি করলেন। রাগারাগি করলেন। আমি কেন যেন সায় দিতে পারলাম না। মেয়ে হেফযখানায় পড়ে। হেফয প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! আমরা পালাক্রমে রোগীর সেবা করি। একদিন আমি রাত জাগি, আরেকদিন মেয়েটা। তার বয়েস অল্প

হলেও সময়ের ফেরে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। বুঝতেও শিখেছে। আমরা মা-মেয়ে দুজনেই আল্লাহর কাছে হরওয়াক্ত দোয়া করে যাচ্ছি। মানুষটাকে যেন আল্লাহ সুস্থ করে দেন। সাধ্যমতো সদকা করছি। শাশুড়ি তো বলতে গেলে জায়নামায থেকেই নড়েন না। শ্বশুর বুড়ো হলেও সংসারের টুকিটাকি কাজ করতে পারেন। তিনিও ছেলের জন্যে কিছু করতে মুখিয়ে থাকেন।

***

মেয়েটার হেফয শেষ হলো। ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। আমরা-আমরাই। ঘরের মানুষেরা মিলে। বাইরের মানুষ বলতে মেয়ের হেফযখানার শিক্ষক। তিনি এসে দোয়া করে গেলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললেন। সদকা চালিয়ে যেতে বললেন। বাবা-মাকে দোয়া করতে বললেন। তাদের দোয়া অনেক কাজে লাগবে!

সেদিন রাত জাগার পালা ছিল মেয়ের। বাবাকে ওষুধ খাইয়ে খাটের বাজুতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। মধ্যরাতে আবার ওষুধ খাওয়াবে! কী মনে করে, মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল। সূরা বাকারা তিলাওয়াত শুরু করে দিল। শেষ করতে করতে আবার চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তার মনে হলো, কে একজন তার নাম ধরে ডেকে বলছে :

-ওঠো ওঠো! ঘুমিও না! তোমার দয়ালু রব জেগে আছেন, তুমি কেন ঘুমিয়ে আছ? এখন দোয়া কবুলের সময়! ওজু করে নামায পড়ো। আল্লাহর কাছে দোয়া করো! তুমি যা চাইবে তিনি দিয়ে দেবেন!

মেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি ওজু সেরে নামাযে দাঁড়াল! দু-হাত তুলে আল্লাহর কাছে দুআ করল। আকুল কান্নায় ভেসে বাবার সুস্থতা কামনা করল। আবার আগের মতো বাবার খাটের পাশটিতে এসে বসল। একসময় ঘুম এসে গেল। ফজরের নামাযের সময় একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

-এ্যাই মেয়ে, কে তুমি? এখানে কেন ঘুমিয়ে আছ?

চোখ মেলে দেখে বাবা তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চোখে প্রশ্ন! আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

উত্তর দেবে কী, মেয়েটা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। চেঁচিয়ে আমাকে ডাকল। দাদা-দাদুকে ডাকল! আব্বু কথা বলছেন! আব্বু কথা বলছেন! সবাই ঘুমচোখে ছুটে এল। হাসি-কান্নায় একাকার! আল্লাহর আজীব

কারিশমা! তাঁর কুদরত বোঝা বান্দার সাধ্যে কুলোবে না! আমাদের সংসারটা আবার আগের মতো হয়ে গেল। আনন্দ আর সুখ ফিরে এল! আল্লাহ কেন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কেন মাফ করে দিলেন, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই! তিনি খুশি হলেই আমরা খুশি!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৪

অভিব্যক্তির শক্তি

কঠোর ভাষা, পিলে চমকানো গলাবাজি, তুমুল বকাবকি দিয়ে অনেক সময় যা করা সম্ভব হয় না, চোখের কটমটে দৃষ্টি আর শীতল চাহনি দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়ে বেশি করা সম্ভব হয়। মানুষের আচরণের মাঝে প্রচণ্ড সুপ্তশক্তি আছে। তবে শক্তিটা ব্যবহার করতে জানা চাই! কিছু চিত্র তুলে আনা যাক।

***

-এক-

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এল। চেহারায় ব্যথা ও অনুতাপ দুটোই মিশে আছে।

-কাঁদছ কেন?

-খালামনি মেরেছে!

-নিশ্চয় দুষ্টুমি করেছ?

-না, আমি শুধু একটা গ্লাস ভেঙে ফেলেছি!

মা অবাক হলেন। ছেলে যে বিচ্ছু, সহজে তো কাঁদার কথা নয়। আবার তার বোনেরও যে স্বভাব, ছোট বাচ্চার ওপর হাত তুলবে না। ব্যাপার কী?

-কী ব্যাপার, তুই কি ওকে মেরেছিলি?

-না তো!

-তাই তো বলি! তুই তো মারার কথা নয়। কী হয়েছে, খুলে বল দেখি! ওর আচরণ আমাকে ভীষণ অবাক করেছে! এই ছেলেকে তো গদা দিয়ে পিটিয়েও চোখের পানি বের করা যায় না। তুই এমন কী করলি যে, তার মধ্যে যুগপৎ ভয় আর অনুতাপ দুটোই জেগে উঠেছে?

-সে দুষ্টুমি করছে দেখে, বার বার বলেছি গ্লাসটা ধরবে না। তবুও ছেলে যদি কথাটা কানে তুলতো! একটু পর ঠিকই সে গ্লাসটা ভাঙল। আমি তার দিকে রক্তচক্ষু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেঘস্বরে বললাম :

-তাড়াতাড়ি ভাঙা কাচগুলো তুলে নাও! শিগগির তোলো বলছি! ছেলে দেখলাম বেশ ভড়কে গেছে! সুড়সুড় করে সব কুড়িয়ে নিল। আমার হাতে ভাঙা কাচ দিয়েই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল!

-তাই বল! কিন্তু ও তোর খরদৃষ্টিতেই ভয় পেয়ে গেল! তা হলে এতদিন তাকে মেরে কি ভুল করেছি?

-আপু! ছোটদের মারাই কিন্তু একমাত্র সমাধান নয়! মারা ছাড়াও অভিব্যক্তি দিয়ে তাদের শাসন করা যায়! অবশ্য বেশি শাসন করে ফেললে, তাদের মনের ভয় কেটে যায়! তখন আর কিছুতেই কিছু হয় না। আমার যে আচরণে ভয় পেয়েছে, তোর থেকে সে আচরণ পেলে হয়তো ভয় পাবে না! আবার পেতেও পারে! কারণ, তোর কাছ থেকে সে দুষ্টুমির জন্যে মার খেয়ে অভ্যস্ত! এখন ভিন্ন আচরণ পেলে ভড়কে যেতেও পারে!

-দুই-

মা মারা গেছেন! ছোট্ট মেয়েটাকে এতিম করে। বাবা উপায়ান্তর না দেখে আবার বিয়ে করলেন। নতুন মা-টা ভালো পড়ল না। প্রথম দিন থেকেই মেয়েটার পিছু নিল। আস্তে আস্তে স্বামীর মনও মেয়ের প্রতি বিষিয়ে তুলল। অনাদর অবহেলায় মেয়েটা আস্তে আস্তে আত্মমুখী হয়ে উঠল। হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করল।

নতুন ঘরেও সন্তান এল। বড় হয়ে এরাও বাবা-মায়ের দেখাদেখি, সৎ বোনের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করে দিল! মেয়ের মামা আবার ভাগ্নির প্রতি বেশ টান অনুভব করেন। বোন মারা যাওয়ার পর, ভাগ্নিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, দুলাভাইয়ের অনড় অবস্থানের কারণে পারেননি। এতদিন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশে ফিরে এতিম ভাগ্নির খোঁজ নিতে এলেন। ঘরে পা দিয়েই পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা ধারণা হয়ে গেল। রাতে খাবারের পর ভাগ্নিকে সাথে রাখলেন। গল্প করার ছলে সবকিছু একে একে জেনে নিলেন! তারপর চিন্তাভাবনা করে ভাগ্নিকে বললেন :

-তুই কি চাস, সবাই তোকে আদর করুক! গুরুত্ব দিক?

-জি মামা চাই! খুউব চাই!

-তা হলে তোকে একটা কাজ করতে হবে!

-কী কাজ? আব্বু-আম্মু মারবে না তো?

-না মারবে না। তুই নিশ্চিত থাক! এবার থেকে তোকে নতুন মা অন্যায়ভাবে বকাবকি করলে, তুই একদম ভয় পাবি না। আবার রাগও দেখাবি না!

-তা হলে কী করব?

-নতুন মায়ের বকা শেষ হলে শুধু বলবি, আমি কোনো অন্যায় করিনি! আমাকে আপনি শুধু শুধু বকাবকি করেছেন!

-এমন কথা বললে তিনি আমাকে মেরেই ফেলবেন!

-মারুক! মারা শেষ হলে তুই সাহস করে আবারও বলবি, আমি কোনো অন্যায় করিনি, আমাকে আপনি শুধু শুধু মেরেছেন!

-যদি ঘর থেকে বের করে দেয়?

-উঁহুঁ! যতকিছুই হোক, মোটেও বের করতে পারবে না! তুই যদি সাহস করে অন্তত তিন দিন এভাবে অটল থাকতে পারিস, দেখবি এরপর থেকে তোর নতুন মায়ের আচরণ বদলে গেছে!

-আব্বুও তো মায়ের কথা ধরে মাঝেমধ্যে আমাকে মারধর করেন!

-তাকেও এভাবে জবাব দিবি! তবে খেয়াল রাখবি, বেয়াদবি যাতে না হয়। কথার স্বর যেন উঁচু না হয়। কথায় কোনো ধরনের ঝাঁজ যেন প্রকাশ না পায়! একদম শীতল কণ্ঠে, ঠান্ডা মাথায় ধীরস্থির ভঙ্গিতে কথাটা বলবি! দেখবি তোর বাবাকে তিন দিন বলতে হবে না, প্রথমবারেই কাজ হয়ে যাবে!

-তিন-

মা বহু চেষ্টা করেছেন, ছেলেরা যেন ময়লা জামা-কাপড় নির্দিষ্ট একটা স্থানে রাখে! কিন্তু কে শোনে কার কথা! যে যার ইচ্ছেমতো এখানে-সেখানে ফেলে ছড়িয়ে রাখছে!

তিনি কোনো সমাধান বের করতে পারলেন না। তিনি চান না কাজের বুয়া ছেলেদের রুমে গিয়ে জামা-কাপড় কুড়িয়ে আনুক! এদিকে ওরাও কথা শুনছে না! নিজেও কাজটা করতে পারেন, কিন্তু এতে ছেলেগুলো কুঁড়ে হয়ে যাবে! শৃঙ্খলা শিখবে না।

বুদ্ধি-পরামর্শ করে ঠিক করলেন, তাদের কাপড় ধোয়া বন্ধ করে দেবেন। তাই করলেন। ময়লা কাপড় জমতে জমতে ডাঁই হয়ে গেল। আর পরার

মতো কাচা কাপড় নেই। কী করবে বাধ্য হয়ে জামা-কাপড় নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এল!

-চার-

রাগারাগি বা বাড়াবাড়িই সব সমস্যার সমাধান নয়, চুপ থাকা, ভদ্রভাবে নিজের মতামত জানিয়ে দেয়া, শীতল আচরণের মাধ্যমেও অনেক সময় সংশোধন করা যায়। তবে শীতল আচরণটা যেন দীর্ঘমেয়াদি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

আমি আমার আচরণের মাধ্যমেই আশেপাশের মানুষের কাছে অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারি! আবার ঘৃণিতও হয়ে উঠতে পারি! মানুষ আমার সাথে কেমন আচরণ করবে, সেটা আসলে আমিই তাদের শেখাই! আমার আচরণই তাদের আমার সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করবে!

কিছু শিক্ষক উদারতা দেখিয়ে ছাত্রদের অশোভন আরচণ মেনে নেন। আবার কিছু শিক্ষক নিজের আচরণের কারণে ছাত্রদের অশোভন আচরণ করতে উৎসাহ জোগান! কিছু মানুষ নিজের আচরণ দিয়ে মানুষকে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে উৎসাহিত করেন!

***

খলীফা হারুনুর রশীদের একটা উক্তি আছে :

-অন্যের মন্দ আচরণের উচিত জবাব সেটাই যা চোখে দেখা যায়, যেটা কানে শোনা যায় সেটা নয়!

মানে তিনি বলতে চেয়েছেন, গলা উঁচিয়ে হাঁকডাক করলেই সেটা উচিত মোক্ষম জবাব হয়ে যায় না। আমার উপযুক্ত অভিব্যক্তিই হতে পারে উচিত জবাব! তবে কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে হবে।

ক. অপছন্দনীয় ও উৎকণ্ঠাজাগানিয়া বিষয়কে চুপচাপ মেনে নেয়া সঠিক আচরণ নয়।

খ. অহেতুক গালি-গালাজ, অর্থহীন বকাবকি সব সময় উচিত ফল নিয়ে আসে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্পর্কই নষ্ট করে দেয়।

গ. কথা বা বকা নয়, অর্থবহ ভঙ্গিতে চুপ থাকাও অনেক সময় ভীষণ শক্তিশালী প্রত্যুত্তর হয়!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৫

দৌড়-প্রতিযোগিতা

নিঃসন্তান দম্পতি। পরিবারেও সচ্ছলতা নেই। দিনে আনি দিনে খাই। তবুও দুজনের মনে সুপ্ত বাসনা, একটা সন্তান যদি হতো! সংসারটা ভরে উঠত! টানাটানির সংসার হলেও, বাড়তি একট মুখ হলে অবস্থার ইতরবিশেষ হবে না। আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। দীর্ঘদিন পর একটা কন্যাসন্তান এল। ঘর আলো করে।

বাবা-মায়ের চোখের মণি! দু-দণ্ড চোখের আড়াল হতে দেন না। বাবা কামারের কাজ করেন। একটু পর পর ঘরের লাগোয়া দোকান থেকে এসে, মেয়ের চাঁদপনা টুকটুকে মুখ দেখে যান। আশায় বুক বাঁধেন!

আস্তে আস্তে বড় হলো। পাঁচ বছরে পা দিল মেয়েটা। মজার মজার কথা বলে। বাড়িময় ছুটে বেড়ায়। মা-কে এটাসেটা বাড়িয়ে দেয়। বাবার জন্যে খাবার নিয়ে দোকানে যায়। নিত্যনতুন বায়না ধরে। এর মাঝে বাবা-মা আবিষ্কার করলেন, মেয়ের অদ্ভুত এক শখ আছে; দৌড়ানোর শখ। বাড়ির পেছনের উঠোনটাতে মেয়ে একমনে দৌড়ায়। প্রথম প্রথম মনে হতো মেয়েটা প্রজাপতি বা ঘাসফড়িংয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে! পরে ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। না, মেয়েটা দৌড়ে আনন্দ পায়। বাধা দেয়ার প্রশ্নই আসে না। একা একা খেলছে, খেলুক না! খারাপ কিছু তো আর করছে না।

***

একদিন এভাবে দৌড়াতে গিয়ে পা-টা মচকে গেল। বেকায়দায়। প্রচণ্ড ব্যথায় নীল হয়ে গেল। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল সামান্য চোট লেগেছে, রাতের বেলা জ্বরের ঘোরে ভুল প্রলাপ বকতে শুরু করলে, বাবা-মায়ের টনক নড়ল। সাথে সাথে ডাক্তার ডাকা হলো। পরীক্ষা করেই ডাক্তারের ভ্রু কুঁচকে গেল। কী ভেবে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে বললেন। দ্রুত।

***

কাজ হলো না। অজানা এক কারণে মচকে যাওয়া পা-টা দিনদিন পাটকাঠির মতো শুকিয়ে যেতে শুরু করল। কী আর করা, বাধ্য হয়ে নিয়তিকে মেনে নিতে হলো। এত ফুটফুটে একটা মেয়ে, কয়েকদিনের ব্যবধানে এভাবে শুকিয়ে যাবে! এভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়বে? মেনে নিতে কষ্ট হয়!

***

দুঃখ ভারাক্রান্ত পিতা একদম ভেঙে পড়ল। স্ত্রী স্বামীর অবস্থা দেখে নিজেকে সামলে নিল। মনের কষ্ট মনেই কবরচাপা দিয়ে রাখল। স্বামীকে বোঝাল। কিন্তু মানুষটা যে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। স্ত্রী বুদ্ধি করে স্বামীর এক বাল্যবন্ধুকে ডেকে আনাল। বন্ধুটি শিক্ষিত। বড় চাকরি করে। তাই স্বামী তার কথার গুরুত্ব দেয়।

***

-কিরে অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন? দোকানেও যাস না শুনলাম!

-আর বলিস না! তুই তো জানিস, কত চেয়ে-কেঁদে একটা সন্তান পেলাম, তার এই পরিণতি! তার চেয়ে সন্তান না হলেই তো ভালো ছিল!

-তুই এত ভেঙে পড়ছিস কেন রে! তুই পরিশ্রমী মানুষ! খেটে খাওয়া শক্তপোক্ত পোড় খাওয়া লোক! তোর এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে?

-কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে!

-এখন হা-হুতাশ করে কোনো লাভ আছে? আর কন্যাসন্তানের আলাদা একটা গুরুত্ব আছে!

-কিন্তু এই পঙ্গু মেয়েকে কীভাবে বড় করি? কে বিয়ে করবে এই মেয়েকে?

-চিন্তা করিস না। কন্যাশিশুর মাঝে আল্লাহ বিশেষ সৌন্দর্য ও কল্যাণ অন্তর্নিহিত রাখেন!

-তুই ভাঙা পায়ের মধ্যে সৌন্দর্য আর কল্যাণ কোথায় পেলি! সব জায়গায় তোর পুথিগত বিদ্যা ফলে না রে!

-ফলবে ফলবে! তুই দেখিস একদিন! যাবার আগে একটা কথা বলে যাই! মন খারাপ না করে, মেয়ে কিসে আনন্দ পায় সেটার দেখভাল কর। মেয়েকে আনন্দে রাখার ব্যবস্থা কর!

***

বন্ধু চলে যাওয়ার পর মেয়ের শিয়রে গিয়ে বসল। গত কয়েকদিন আসা হয়নি। কীভাবে আসবে! মেয়েটাকে দেখলেই যে বুক ফেটে কান্না আসে শুধু! কী মেয়ে কী হয়ে গেল!

-মা-রে! তোর কী করতে ইচ্ছে করে?

-বলব?

-বল।

-আমার না এখনো দৌড়াতে ইচ্ছে করে!

-তা তো সম্ভব নয় রে মা!

-আচ্ছা আব্বু, তুমি আমাকে পিঠে নিয়ে দৌড়াতে পারবে না? এভাবে হলেও আমার দৌড়ের সাধ কিছুটা হলেও মিটত!

-ঠিক আছে, চল দেখি কতটুকু কী করতে পারি!

***

ফাঁক পেলেই বাবা-মেয়ের কাজ হয়ে দাঁড়াল দৌড়ানো! বাবার পিঠে মেয়ে। বাবার প্রথম প্রথম কষ্ট হলেও পরের দিকে অভ্যেস হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর শিক্ষিত বন্ধু আবার দেখতে এল। মেয়েকে নিয়ে দৌড়াতে দেখে, তার মাথায় একটা চিন্তা এল; শহরে প্রতিবছর বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। তাতে বয়স্কদেরও একটা ইভেন্ট আছে! পিঠে নির্দিষ্ট ওজনের একটা ভার নিয়ে দৌড়াতে হয়। বাবা-মেয়েকে ওই ইভেন্টে নামিয়ে দিলে কেমন হয়?

সব শুনে বাবা-মেয়ে দুজনেই রাজি হলো। বন্ধু কর্তৃপক্ষকে বলেকয়ে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করল, নির্দিষ্ট ওজন নয়, মেয়েকে পিঠে চড়িয়েই দৌড়াবে! দর্শক একজন প্রতিযোগীকে ব্যতিক্রম দেখে অবাক! লোকটার পিঠে ছোট্ট মেয়ে কেন? আবার দৌড়াচ্ছেও সবার আগে আগে! দৌড় শেষ হওয়ার আগেই সবার জানা হয়ে গেল, মেয়েকে নিয়ে বাবার সংগ্রামের কথা! কষ্টের কথা! সবার মাঝে সহানুভূতি জেগে উঠল! এদিকে দীর্ঘদিনের অনুশীলনের কারণে বাবা-মেয়েই দৌড়ে প্রথম হলো! শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রথম পুরস্কার তুলে দেয়ার পাশাপাশি বাবাকে আশ্বাস দিল, আজ থেকে তোমার মেয়ে আমাদের মেয়ে! তার চিকিৎসা-পড়াশোনা সবকিছুর দায়িত্ব আমাদের!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৬

অক্ষত লাশ

সৌদি আরবের আবহা শহরের কথা। একটা অসমাপ্ত মহাসড়কের কাজ পুনরায় শুরু হলো। কাজ চলতে চলতে অর্ধাঅর্ধি আসার পর দেখা গেল, ঠিক মুখেই একটা কবরস্থান। ইঞ্জিনিয়ার পড়লেন বিপাকে! আইন অনুযায়ী কবরের ওপর দিয়েই রাস্তার কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

***

ইঞ্জিনিয়ার স্থানীয় লোকদের সাথে কথা বললেন। মতামত নিলেন। সরকারি নির্দেশনামাও দেখালেন। এলাকাবাসী কোনো দ্বিরুক্তি করল না।

তবে একটা একটা অনুরোধ রাখল।
-আমরা চাই নতুন কবরগুলো সসম্মানে সরিয়ে নিতে!
-ঠিক আছে! কোনো সমস্যা নেই! আমরা ততদিন কবরস্থান এলাকার পরের কাজগুলো এগিয়ে রাখি!

***

কবর স্থানান্তরের কাজে সড়কবিভাগের কিছু লোকও নিয়োজিত হলো। দ্রুত শেষ করার জন্যে। নতুন কবরগুলো কাজ শেষ। পুরোনো কবরগুলো আপন অবস্থাতেই থাকবে। অবশ্য পুরোনো কবরের নাম-নিশানাও এতদিনে মুছে গেছে। হাড়গোড় কিছু পাওয়া গেলে, উঠিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও দাফন করে দেয়া যাবে।

বুলডোজার নিয়ে কাজ শুরু হলো। কিছুক্ষণ কাজ করার পর দেখা গেল, একটা মুছে যাওয়া কবর থেকে তরতাজা একটা লাশ বেরিয়ে এল। অক্ষত। খোঁজ নেয়ার পর জানা গেল, মানুষটাকে দাফন করা হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে। তার আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেয়া হলো। মানুষটা কেমন ছিল, অনুসন্ধান চালানো হলো। লাশের পিতা বললেন :

-আমার ছেলের একটা গুণ ছিল, সে কখনো 'তাকবীরে তাহরীমা' ছুটতে দিত না। এ জন্য আগে থেকেই নামাযের প্রস্তুতি নিয়ে থাকত। আযান হলেই মসজিদে চলে যেত। শীত-গ্রীষ্ম কোনো ঋতুতেই সে পিছপা থাকত না। সব সময় প্রথম কাতারে নামায পড়ত। আমি তাকে ফজরের জন্যে জাগাতে পারিনি! আমি ওঠার আগেই সে মসজিদে যাওয়ার জন্যে ওজু করে প্রস্তুত হয়ে থাকত! জানি না, সে এত ছোটবেলায়, কীভাবে নামাযের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল! আমি বাবা হয়েও এতটা গুরুত্ব দিতে শিখিনি! আমি মনে করি, এটা আল্লাহর খাস রহমত! যে কেউ এভাবে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে পারে না!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৭

জ্ঞানের শক্তি

ফাতিমা আলাই। পড়াশোনা করে মাদ্রিদের এক ভার্সিটিতে। বোটানিতে। তার পরিবার মরক্কো থেকে কাজের সূত্রে এখানে এসেছে। তাদের আদি পূর্বপুরুষও এখানে ছিল। ইনকুইজিশনের অকথ্য নির্যাতনের মুখে তারা জিব্রাল্টার প্রণালি পার হয়ে, মাগরেব (মরক্কো) চলে যেতে বাধ্য হয়।

***

ফাতিমাকে দেখলে বোঝা যায় না, সে একটা মুসলিম পরিবারের মেয়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা কোনোটাতেই না। তার ওঠাবসাও মুসলমানদের সাথে নয়। তার ফ্রেন্ডসার্কেলের বেশির ভাগই স্থানীয়। কোনো আরব বন্ধু নেই বললেই চলে। অথচ তাদের ভার্সিটিতে মরক্কো-আলজেরিয়া থেকে আসা প্রচুর ছাত্র পড়াশোনা করে।

তার একজন বান্ধবীর নাম মারিয়া। কট্টর খ্রিষ্টান পরিবারের মেয়ে। সাক্ষাৎ রানি ইসাবেলা। এমনিতেই স্পেনে খ্রিষ্টধর্ম অতটা ভালো করে মানা হয় না। তবে মারিয়ার পরিবার একটু ব্যতিক্রমই বলা চলে।

মারিয়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলল :

-ফেটিমা! তোমাদের নবী তো ৯০টা বিয়ে করেছে, তাই না! একটা মানুষ এতগুলো বিয়ে কীভাবে করেছে?

-না তো! তোমাকে একথা কে বলেছে?

-আমাদের গির্জার বড় ফাদার!

-উনি ঠিক বলেননি!

-না উনি ভুল বলতে পারেন না। তিনি অনেক বড় ব্যক্তি। তার কাছে 'কনফেশন' করলে আমাদের পাপ মাফ হয়ে যায়।

***

ফাতিমা আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ি চলে এল। অস্থির হয়ে একটা সীরাতের কিতাব খুঁজল। পেল না। সে বা তার বাবা-মা কেউই ধার্মিক তো নয়ই, তদুপরি আরব হয়েও ইসলাম সম্পর্কে তাদের খুব একটা জানাশোনাও নেই। তার দাদা ফরাসিদের সেনাছাউনিতে চাকরি করতেন, থাকত কোয়ার্টারে। সে সুবাদে তার বাবাও সেখানে বেড়ে উঠেছে। পড়ালেখা করেছে ফরাসি স্কুলে।

ফাতিমা মন খারাপ করেই দুপুরটা কাটিয়ে দিল। বিকেলটাও ঝিম ধরে থাকল। বিষয়টা মায়ের দৃষ্টি এড়াল না।

-আজ সকাল থেকে তুমি এমন গোমড়া হয়ে আছ কেন?

-আম্মু! আমাদের নবীজি সম্পর্কে তুমি কী জান? তিনি কয়টা বিয়ে করেছিলেন?

-আমি তো খুব বেশি কিছু জানি না। এমনিতে শুনেছি তিনি অনেকগুলো বিয়ে করেছিলেন।

রাতে বাবা ফিরে এলে, তার সাথেও কথা হলো। বাবাও খুব বেশি কিছু জানেন না। মাঝেমধ্যে নামায পড়েন। এটুকুই।

ফাতিমা সারারাত ঘুমাল না। নেট ঘেঁটে ইসলাম ও নবীজি সম্পর্কে আরবীতে যেখানে যা পেল, পড়ে ফেলল। যদিও সে ছেলেবেলা থেকেই স্পেনিশে অভ্যস্ত। কিন্তু ঘরোয়াভাবে আরবীর কিছুটা চর্চা আছে। কথাবার্তাও হয় আরবীতে!

***

কয়দিন পর, ফাতিমা বাবা-মাকে জানাল, সে কিছুদিনের জন্য মরক্কো যেতে চায়।

-ওখানে গিয়ে কী করবি?

-ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই। শিখতে চাই। আর কুরআন কারীম হিফয করতে চাই।

মেয়ের জেদ দেখে বাবা-মা কিছু বললেন না। দাদার বাড়িতে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবা নিজেই মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ছুটি পাওয়া গেল না। স্ত্রীকে সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

তার মনে একটা অপরাধবোধও কাজ করছিল, মেয়েকে তো তিনি দ্বীনি শিক্ষার লেশমাত্রও দিতে পারেননি। মেয়ে যখন নিজ থেকেই শিখতে চাচ্ছে, বাধা দিতে যাবেন কেন?

***

ফাতিমা দাদার বাড়িতে এসে, পাশের একটা মাদরাসায় কুরআন কারীম হিফযে লেগে গেল। অন্য ছাত্রীরা সবাই তার চেয়ে অনেক ছোট। অতুলনীয় পরিশ্রম করে, ছয় মাসের মাথায় খতম শেষ হলো। পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা-পড়াশোনাও চলতে লাগল।

***

ফাতিমা টানা একবছর পড়াশোনা চালিয়ে গেল। এর মধ্যে মা ফিরে গেছেন। বাবাও একবার এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। মেয়ের উন্নতি দেখে, তিনি ভীষণ অনুপ্রাণিত। তার মনেও ক্ষীণ ইচ্ছা জেগেছে, ছেলেবেলায় দাদার পীড়াপীড়িতে করা কুরআনের হিফযটা আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। একদিন লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে স্ত্রীকে সেটা বলেই ফেললেন। স্ত্রী বললেন, আমারও তো এমন একটা চিন্তা কয়েকদিন ধরে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে!

***

ফাতিমা মরক্কো থেকে অন্য মানুষ হয়ে ফিরে এল। আবার নতুন করে ভার্সিটিতে যাওয়া শুরু করল। তার সাথের সবাই এক বছর এগিয়ে গেছে। সে প্রথম দিন গিয়েই মারিয়াকে খুঁজে বের করল। তার সাথে এবার আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা শুরু করল।

এক সপ্তাহের মাথায় মারিয়া জানাল,
-এতদিন আমি ভুলের মধ্যে ছিলাম। আমাকে ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে। আমি সত্যিই অনুতপ্ত। ইসলাম সম্পর্কে আমি বেশ কৌতূহল অনুভব করছি! বিশেষ করে নবীজির ঘরের মানুষ 'মারিয়া কিবতিয়া' সম্পর্কে। নবীজি একজন বাঁদির সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন, সেটা আমাকে জানতেই হবে। যেহেতু তার আর আমার নাম এক।

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৮

পরকালের চিন্তা!

আঙুরের দিন শেষ। আগামী মৌসুমের আগে আর আঙুর পাওয়া যাবে না। তারপরও মানুষটার শখ জাগল, আঙুর খাবে। কিন্তু পাবে কোথায়? আড়তে গিয়ে ফলদারকে অনুরোধ করল। যে করেই হোক, কিছু আঙুর জোগাড় করে দিতে। খেতে ইচ্ছে করছে, কী করা! দাম নিয়ে চিন্তা করবেন না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কেজি খানেক আঙুর জোগাড় হলো। খুশিমনে বাড়ি ফিরে গিন্নিকে বলল :
-আঙুরগুলো সযতনে রেখে দাও! রাতে ফিরে সবাই মিলে খাব!

***

কাজকর্ম সেরে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসল। খাওয়ার পাট চুকতেই আর তর সইল না!
-কই গো, নিয়ে এস!
স্ত্রী জড়সড় হয়ে সসংকোচে বলল :
-আর কী বলব! ওরা আঙুরের কথা শোনামাত্রই কাড়াকাড়ি করে সব খেয়ে ফেলেছে! আমাকেও একটা আঙুর সাধেনি!

***

লোকটা স্ত্রীর কথা শুনে থমকে গেল। কী ভেবে দ্রুত উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল। স্ত্রীও চিন্তিত মনে পিছু পিছু গেল। মানুষটা হনহন করে সদরের

দিকে চলছে। স্ত্রীর ডাক শুনেও ফিরে তাকাল না। দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও মানুষটা এল না। বাড়ির সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। গেল কোথায়? ছেলেরা খুঁজতে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত, তখন কর্তা বাড়ি ফিরল। কাউকে কিছু না বলে সোজা বিছানায়।

-কোথায় ছিলেন?

-বাজারে গিয়েছিলাম!

-এত রাতে? দোকান বন্ধ করে আসেননি?

-তা এসেছি!

-তা হলে!

-এত শখ করে, আঙুর কিনে আনলাম। ওরা জানে, আমি আঙুর খুবই পছন্দ করি! তারপরও ওদের ফেলে খাইনি। কিন্তু ওরা আমার জন্যে একটা আঙুরও রাখল না! তারা অবুঝ হলে, মনকে বুঝ দিতাম! কিন্তু ধিঙ্গি হয়ে বাবাকে ভুলে গেল! আমার জীবদ্দশাতেই যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে মৃত্যুর পর তাদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি? খেয়ে ওঠার পর এ চিন্তাটাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করলাম না!

-কী সিদ্ধান্ত?

-আমার সমস্ত সম্পদ বিলি-ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত!

-হায়! হায়! আপনি সামান্য আঙুরের জন্যে সন্তানদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন?

-আরে, সব কথা না শুনেই কথা বলতে শুরু করো কেন? সন্তানকে বঞ্চিত করব কেন! আল্লাহ তা'আলা আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন! ওদের জন্যে, তোমার জন্যে পরিমাণমতো সম্পদ রেখে, বাকিটুকু মসজিদ-মাদরাসার জন্যে ওয়াকফ করে এসেছি! নিজের চিন্তা নিজেকেই করতে হবে!

জীবন জাগার গল্প : ৬৫৯

কুপুত্র!

ঘরটার সামনে বেশ কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা লাশ নামছে, গোসল দেয়া শেষ হলে, গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কবরস্থানের দিকে। এখানকার যিনি দায়িত্বশীল, তার

ঝাঁপিতে অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা সঞ্চিত আছে। তিনি একটা ঘটনার স্মৃতিচারণ করে বললেন :

-সেদিন জানাযার ভিড় ছিল তুলনামূলক বেশি। আমরা গোসল দেয়ার পর, কয়েকজনের জানাযা একসাথে পড়ছিলাম। সকালের দিকে আমাদের খবর দেয়া হয়েছিল। আমরা গিয়ে নিজেদের লাশগাড়িতে করে মহিলাকে নিয়ে এসেছি। গোসল দেয়ার পর, মুর্দার কোনো আত্মীয় উপস্থিত না থাকাতে জানাযা পড়তে পারছিলাম না। মধ্য দুপুরে পাঁচজন যুবক এল। আলাদা আলাদা গাড়ি নিয়ে। মৃত মহিলার ছেলে। ততক্ষণে জানাযার ভিড় লেগে গেছে। নামায শেষ হলো। আগে যারা গাড়ি বুক করে রেখেছিল, তাদের লাশ কবরে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের গাড়ি ছিল পাঁচটা। সব গাড়ি কবরস্থানে চলে গেছে। বাকি লাশগুলোর আত্মীয়রা নিজেরাই গাড়ি নিয়ে এসেছিল। নিজেদের ভাড়া করা গাড়িতে করে মুর্দা নিয়ে গেছে।

এই একটা লাশ এখনো পড়ে আছে। প্রচণ্ড গরমে লাশ বাইরে রাখা ঠিক নয়। আমি তাদের বললাম :

-তোমাদের মা-কে নেয়ার ব্যবস্থা করো।

-কীভাবে? আমাদের গাড়ীতে করে তো লাশ নেয়া যাবে না!

-তা হলে তোমরা আমাদেরও কিছু জানাওনি! নিজেরাও ব্যবস্থা করোনি কেন? সেই সকাল থেকেই মহিলা এখানে পড়ে আছেন! এখন গরমে মহিলার লাশ নষ্ট হয়ে যাবে! আমরা কী করব? লাশ আবার হিমাগারে রেখে দেব?

-একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় না?

-আমাদের গাড়ি যা ছিল সবই চলে গেছে!

পাঁচ যুবককে দেখলাম একজন আরেকজনকে গাড়ি আনতে বলছে। কেউ নিজ থেকে যাচ্ছে না। তাদের এহেন আচরণ দেখে, আমি পরিচিত একজনকে ফোন করে তার গাড়িটা দিতে বললাম। সে রাজি হলো। পাঁচ যুবককে বললাম :

-নাও, তোমাদের গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেছে! ওই তো এসে যাচ্ছে! ভাড়া কে দিবে?

ভাড়া দেয়া নিয়ে ঠেলাঠেলি লেগে গেল। প্রত্যেকেই ভাড়া দিতে আগ্রহী। বিনিময়ে সে কবরস্থানে যাওয়া থেকে অব্যাহতি চায়। সবাই বলছে, তার কাজ আছে, কবরস্থানে যেতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত একজনও গেল না।

লাশঘরের একজনকে তারা টাকা দিয়ে দায়িত্ব দিল। তারপর যে যার পথে চলে গেল।

★★★

আমি ভাবছিলাম! কে মারা গেছে? মৃত মহিলা কি তাদের কোনো প্রতিবেশিনী? তাদের চাকরানি? দূরসম্পর্কের আত্মীয়া? এই মহিলাই কি তাদের দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেননি? স্তন্যদান করেননি? রাতজেগে ভেজা কাঁথা বদলাননি? তাদের হাসিতে হাসেননি? তাদের কান্নায় কাঁদেননি? তার বিনিময়ে শেষযাত্রায় সন্তানদের কাছে কী পেলেন?

★★★

এই ধরনের সন্তানদের সবাইকে যদি প্রশ্ন করা হয় :

-তুমি কীভাবে বেড়ে উঠেছ? তোমাদের ছেলেবেলা কীভাবে কেটেছে?

তাদের নিশ্চিত উত্তর হবে :

-আমাদের সময় কাটত ডিশ-চ্যানেল দেখে। বিকেল কাটত ভিডিও গেমস খেলে। ছুটির দিনগুলি কাটত নিত্যনতুন সিনেমা দেখে। আজেবাজে বই পড়ে। দুষ্ট বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে।

তাদের যদি প্রশ্ন করা হয় :

-নামায পড়ো?

-আব্বু-আম্মু কখনো আমাদের নামাযের জন্যে বলেনি তো! নামায পড়তেও শেখায়নি!

-কুরআন কারীম পড়তে পার?

-দেখে দেখে পারি না। এমনিতে আলহামদু সূরা, কুল হুয়াল্লাহ পারি।

-হাদীস শরীফ?

-ধর্ম বইয়ে পড়েছিলাম, কী যেন! ও হ্যাঁ, ইন্নামাল আ'মালু........!

কারও বয়ান শোনোনি? কারও কাছে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করোনি? সব প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক হবে। এমন ছেলেমেয়ে ব্যস্ততার কারণে মাকে কবরস্থানে নিয়ে যেতে অজুহাতে পিছপা হবে না তো কী হবে?

★★★

এ জন্য বাবা-মা'ই দায়ী। তারা সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেনি। ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার মানে এই নয়, সন্তানকে হুজুরই বানাতে হবে! ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানানোর পাশাপাশিও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া যায়। নামাযী হিশেবে গড়ে তোলা যায়। হাফেয বানানো যায়। ধার্মিক ও মুত্তাকী হিশেবে গড়ে তোলা যায়।

জীবন জাগার গল্প : ৬৬০

হজের মর্মকথা

ড. মুস্তাফা মাহমুদ। সাধারণত উজ্জীবনমূলক লেখালেখি করেন। তার একটা স্মৃতিচারণ। আমার এক নাস্তিক বন্ধু ফিচেল হাসি দিয়ে বলল :

-তোমাদের হজব্রত পালনের পুরো বিষয়টাই তো 'প্যাগান' (পৌত্তলিক) সংস্কৃতি থেকে নেয়া। এখানে তো আমি ধর্মের কিছু খুঁজে পাই না। এটাও এক ধরনের মূর্তিপূজাই। একটা কালো স্থাপনাকে ঘিরে তোমরা চক্কর খাও, পাক খাও। এটাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? তোমার যুক্তি কী বলে? শয়তানকে পাথর মারা, সাফা-মারওয়ার মাঝে ছোটাছুটি করা, হাজরে আসওয়াদকে চুমু খাওয়া, শাদা ইহরামের কাপড় পরা, এসব কিছু তো প্রাচীন জাদুবিদ্যা চর্চাকারীদের রসম-রেওয়াজের সাথে মিলে যায়। তোমরা যে কুরবানী করো, এটা কিন্তু প্রাচীন প্যাগানিজম থেকেই এসেছে। তুমি কিছু মনে কোরো না মাহমুদ! আমার কাছে যা সত্য বলে মনে হয়েছে, সেটাই তোমাকে বলেছি। সত্য প্রকাশে তুমি রাগ করলেও আমার কিছু করার নেই।

-তোমার কথা তো শুনলাম। এবার তুমি আমার কথা শোনো :

তুমি কি একটা বিষয় লক্ষ করেছ, জড় ও বস্তুজগতে একটা নিয়ম আছে :

= ছোট বস্তু বড় বস্তুর চারপাশে ঘুরপাক খায়।

= চাঁদ সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

= পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

= সূর্য ছায়াপথের চারপাশে ঘোরে।

= ছায়াপথ আরও বড় ছায়াপথের চারপাশে ঘোরে।

এভাবে চলতে চলতে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। আমরা বলি আল্লাহ বড়। অর্থাৎ তিনি সবচেয়ে বড়। জগতের নিয়ম হিশেবেই ছোট বড়োর চারপাশে ঘুরবে।

দুনিয়াতেও দেখো, একজন বড় ব্যক্তির চারপাশেই মানুষ ভিড় জমায়। একজন ব্যক্তিকে ঘিরে একটা শহর, একটা দেশ, একটা সাম্রাজ্য পর্যন্ত গড়ে ওঠে।

***

কা'বা ঘর পৃথিবীর প্রথম ঘর। এটা একটা প্রতীক। এটাকে দেখলে মানুষ তার অতীতের কথা মনে করবে। তার আসল গন্তব্যের কথা মনে করবে। তার পূর্বপুরুষ কেন পৃথিবীতে এসেছিল সেটা মনে করবে।

***

একজন সৈনিক মারা গেলে, তার কবরে তোমরা ফুল দাও। স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করো। সৌধ তৈরি করো। বলো, এটা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। তার কীর্তির স্বীকৃতি। তোমাদের এ কাজও প্রশ্নবিদ্ধ নয় কী?

***

তুমি কি অনিবার্য মৃত্যুর দিকেই নিরন্তর দৌড়ে চলছ না! তোমার মৃত্যুর পর তোমার সন্তান দৌড় শুরু করবে। তারপর তার সন্তান। এভাবে অবিরত চলতেই থাকবে। সাফা-মারওয়ার দৌড়ানো জীবন-মৃত্যুর একটা প্রতীক। তোমাকে মনে করিয়ে দেবে, বাঁচতে হলে, জীবনধারণ করতে হলে দৌড়াতে হবে। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতেই একসময় মারা যাবে।

***

তুমি হজের কাজগুলোতে প্যাগানিজমের গন্ধ পেয়েছ। সেটা তোমার দেখার ভুল। তুমি প্যাগান দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করেছ বলেই এমনটা হয়েছে।

***

শাদা রঙের ইহরাম পরা মানুষকে কাফনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেলাইবিহীন কাপড় পরা তাকে অনাড়ম্বর-আয়োজনহীন জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

***

শয়তানকে পাথর মারার ব্যাপারটা, নিজের কুপ্রবৃত্তিকে আক্রমণ করার একটা অনুশীলন মাত্র। এটা তোমাকে শেখায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তুমি শয়তানকে, মনের বদ ইচ্ছেগুলোকে আঘাত করতে হবে। হামলা করতে হবে।

***

হাজরে আসওয়াদে চুমু খাওয়া তোমাকে চিত্তশুদ্ধির কথা মনে করিয়ে দেবে। যতই পাপ করো, তোমার শুদ্ধ হওয়া, পাপমুক্ত হওয়ার, নিষ্কলুষ হওয়ার পথ আছে। তাওবা করলেই আল্লাহ মাফ করে দেবেন। গুনাহ মাফ করে দেবেন। পাপ করে ফেললে, তা স্খলনের চেষ্টা বন্ধ করা ঠিক হবে না। কোথাও না কোথাও গিয়ে, নিজের কাঁধকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে অবমুক্ত করার প্রয়াস থামিয়ে রাখবে না।

★★★

আরাফার ময়দানে সবাই জড়ো হয়, সেটা তোমার কাছে খারাপ কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু একজন মুসলিম তা থেকে শেখে, বিশ্বমুসলিম এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা যে যেখানেই থাকুক :

= সবাই এক।

= তাদের রব এক।

= তাদের ধর্ম এক।

= তাদের রাসূল এক।

= তাদের কিতাব এক।

★★★

তুমি সাত বার চক্কর খাওয়া, তাওয়াফ করা, সাঈ করার মাঝে পৌত্তলিকতার গন্ধ পেয়েছ। সত্য কথা হলো, তোমার নাকে সমস্যা। এসবের মাঝে নয়। এভাবে সাত বার কেন, দশ বার চক্কর কাটলে, তখনো তুমি কিছু একটার গন্ধ খুঁজে পেতে।

হজের প্রতিটি কাজ-কৃত্যের মধ্যেই তুমি এক ধরনের 'সমর্পণ' খুঁজে পাবে। যদি তুমি তোমার প্যাগান-দৃষ্টিটাকে একটুখানি যুক্তির মোড়কে আবৃত করতে পার তা হলেই হবে।

লাখো মানুষ খালি পায়ে, খালি মাথায় থাকছে। সবাই একটা লক্ষ্যকে ঘিরে সময় কাটাচ্ছে। এটা কেন করছে?

= আল্লাহর প্রতি নিজের সবকিছু সমর্পণ করার মানসে।

= মহান সত্তার আদেশ পালনার্থে।

★★★

দেখো, তুমি যতই বলো, পৃথিবীর কোনো স্রষ্টা নেই। আচ্ছা, এটা কি সম্ভব? তুমি অফিসে যাও, আদালতে যাও সব জায়গাতেই একটা কেন্দ্র থাকে। একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে। তাকে ঘিরেই ওখানকার যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হয়। তা হলে পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এটা হবে না কেন?

যাকে ঘিরে সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে, তার একটা ভরকেন্দ্র থাকবে না? কা'বা ঘরটাই হলো বিশ্বমুসলিমের ভরকেন্দ্রের প্রতীক। তোমার প্যাগানিজম যাই বলুক না কেন!

জীবন জাগার গল্প : ৬৬১

ফ্রি-ল্যান্স পলিটিশিয়ান!

সহিস শব্দটা ফারসি। মূল উচ্চারণ 'সায়িস'। ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক। সিয়াসি শব্দটা আরবী। অর্থ, রাজনীতিবিদ। দেশে ফারসি ভাষার প্রচলন। আরবীও টুকটাক চলে। রাজামশায় ফারসিতেই বেশ স্বচ্ছন্দ। দরবারে বসে আছেন। একলোক প্রাসাদের বাইরে দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিচ্ছে :

-সিয়াসি লাগবে সিয়াসি! ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, ঘরে ঘরে বিবাদ, পাড়ায় পাড়ায় বিবাদ, গ্রামে গ্রামে বিবাদ অতি সহজেই মিটিয়ে দেই। লাগবে কারও সিয়াসি? অল্প খরচেই বিবাদ মিটিয়ে নিন। এ সুযোগ হেলায় হারাবেন না।

রাজার কান এড়াল না। তিনি উৎকর্ণ হয়ে ঘোষণাটা শুনলেন। সাথে সাথে পেয়াদা পাঠিয়ে দিলেন। লোকটাকে দরবারে হাজির করো। প্রহরী দৌড়ে গিয়ে স্বঘোষিত সিয়াসিকে ক্যাঁক করে ধরল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চ্যাংদোলা করে ড্যাং ড্যাং করে ঝুলিয়ে নিয়ে এল। রাজার সামনে ধপাস করে ফেলল। সিয়াসি ব্যথায় ককিয়ে উঠল। সামনেই রাজাকে দেখে দু-চোখ কপালে উঠে গেল। ধড়মড় করে উঠে কুর্নিশ করল। এমন তোয়াজ-তাজিম দেখে রাজা পুলকিত! খোশ মেজাযে বললেন :

-কী হে! তুমি সায়িস?

-বেয়াদবি মাফ হোক জাহাঁপনা, আমি একজন সিয়াসি!

-ওই হলো! আমি এতদিন ধরে একজন যোগ্য সায়িস খোঁজ করছিলাম। আস্তাবলটা একদম শূন্য হওয়ার জোগাড়। আমার প্রিয় ঘোটকটার আজ মুমূর্ষু দশা। তুমি এখুনি ঘোড়াটার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নাও!

-আলমপনা, আমি একজন সিয়াসি!

-ঠিক আছে বুঝেছি! বেতন বাড়িয়ে দেব। ভালো করে ঘোড়াগুলোর দেখভাল করো! মনে রাখবে, ঘোড়ার কিছু হলে তোমাকে উপোসি করে হত্যা করব! খাজাঞ্চি! নতুন সায়িসকে আস্তাবলের পাশের ঘরটা খুলে দাও। তার জন্যে চাল-ডাল-ঝোলের ব্যবস্থা করে দাও!

★★★

সিয়াসি ভয়ে আর কথা বাড়াল না। কী আর করা অগত্যা মনের কষ্ট মনে চেপে আস্তাবলে গিয়ে জুটল। এও বুঝি তার কপালে ছিল। হওয়ার কথা

ছিল মন্ত্রী, হয়ে গেল ঘোড়ার সান্ত্রি! পোড়াকপাল আর কাকে বলে! কোন ভূতে যে কিলিয়েছিল! আগের রাজার দরবারই কত ভালো ছিল। অতি লোভই আমাকে ডুবিয়েছে। এখন আর পালাবার উপায় নেই।
দায়িত্ব বুঝে নিল। আগের বুড়ো সহিস বলল :
-ভায়া, ঘোড়া সম্পর্কে রাজার কাছে কোনো ওজর-আপত্তি করবে না। এই ঘোড়া রাজার অত্যন্ত প্রিয়। সব সময় ঘোড়ার প্রশংসা করবে। গুণকীর্তন করবে, নইলে তোমাকে উপোসি করে তিলে তিলে হত্যা করবে।
কাজ চলতে লাগল। ঘোড়া তো নয় যেন বাবুরাম সাপুড়ের ঢোঁড়া সাপ! সারাদিন বসে বসে ঝিমোয়! আর একগাদা খায়। তিন দিন পর রাজা ডেকে পাঠালেন।
-কী সায়িস! কেমন চলছে! আমার ঘোড়াকে কেমন দেখলে?
-ভালো মাওলা, খুবই ভালো। তবে....
-এ্যাঁ, তবে আবার কী!
-আপনি যদি অভয় দেন বলতে পারি!
-দিলাম। বলে ফেলো!
-ঘোড়াটা ভালো। তবে আমার মনে হয়েছে, ঘোড়াটা জন্মের পর তার মূল মায়ের দুধ খায়নি।
-কীহ! এত্তবড় সাহস! তুই আমার ঘোড়া সম্পর্কে কটূক্তি করিস! খামোসসস! এই কে আছিস! একে গরাদে পুরে রাখ!

★★★

রাজা উজিরকে খবর দিলেন। অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। হাত পেছনে মুঠ করে। হন্তদন্ত হয়ে উজির হাজির হলেন।
-উজির, তুমিই তো ঘোড়াটা আমাকে হাদিয়া দিয়েছিলে?
-জি! জাহাঁপনা!
-তুমি আমাকে ভেজাল ঘোড়া কেন দিলে? এই ঘোড়া নাকি তার মায়ের দুধ খায়নি?
-মাওলা, আপনি পছন্দ করেছেন দেখে আর কথা বাড়াইনি! কথা সত্য হুজুর! ঘোড়াটাকে আমি বাচ্চা অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। দুধ খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকাতে, অশ্বশাবকটাকে আমাদের কালো গাইয়ের দুধ খাইয়েছিলাম। ওটার দুধ খেয়েই শাবকটা বড় হয়েছে।

★★★

রাজা লোক পাঠালেন সিয়াসিকে ডেকে আনতে। প্রহরী গিয়ে নিয়ে এল।
-তুমি কীভাবে বুঝলে ঘোড়াটা তার মূল মায়ের দুধ না খেয়ে বড় হয়েছে?
-আমি খেয়াল করে দেখেছি, ঘোড়া সাধারণত উঁচু কিছু থেকে ঘাস খায়। অথবা জাবনার গামলা থেকে খায়। একান্ত অপারগ হলে তবেই জমিন থেকে খায়। কিন্তু এই ঘোড়াকে দেখলাম সব সময় খাস জমিনে মুখ দিতে। উঁচু কিছুতে খাবার দিলেও সেদিকে না তাকাতে। এটা গরুর স্বভাব। গরুও সব সময় মেঠো জমি থেকে ঘাস খেতে অভ্যস্ত। বাধ্য হলেই শুধু গামলা থেকে খায়!
-সাব্বাস! এই কে আছিস! সায়িসকে নিয়ে যা! মোরগ রান্না করে ভালো করে খানাপিনা করা!

***

দুদিন না যেতেই রাজা ডেকে পাঠালেন সিয়াসিকে। ভয়ে ভয়ে দরবারে হাজির হলো। আবার কোন ভেজাল লাগে আল্লাহই জানেন।
-সায়িস সাহেব! কী খবর! দিনকাল কেমন যাচ্ছে!
-জি, হুজুর! ভালো।
-তোমাকে ডেকেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে। কাউকে বলা যাবে না। ব্যাপারটা শুধু তোমার-আমার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে!
-কী কাজ জাহাপনা?
-তোমাকে বের করতে হবে, আমার স্ত্রী কেমন মানুষ!!
-হুজুর! আমাকে মাফ করুন। আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না বোধহয়।
-খামোসসস! যা বলছি করো! নইলে....!
সিয়াসি বাধ্য হয়ে মেনে নিল। শুরু হলো গোয়েন্দাগিরি। রানিকে বলা হলো, এবার থেকে প্রাসাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে সাবেক সহিস। কয়েকদিন পর রাজা খবর পাঠালেন :
-কী বুঝলে!
-যা বুঝেছি, তা বলার আগে আমি প্রাণভিক্ষা চাই!
-নির্ভয়ে বলো!
-রানিমাতার সবকিছু ভালো। সুশীলা। গুণবতী। ভদ্র। বিদুষী। মার্জিতা। কিন্তু তিনি জন্মগতভাবে রাজকন্যা নন।
-সাবধান! বেয়াদবির একটা সীমা থাকা উচিত! প্রহরী! এই বেত্তমিজকে বন্দী করে রাখ! কোনো খাবার-পানীয় দেয়া যাবে না তাকে।

***

রাজা থাকতে না পেরে, সাথে সাথে ঘোড়া ছুটিয়ে পাশের রাজ্যে হাজির হলেন। শাশুড়িকে গিয়ে ধরলেন।

-আপনারা আমার কাছে কাকে বিয়ে দিয়েছেন?

-কেন, আমাদের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি!

-আপনার রক্তের মেয়ে?

বৃদ্ধা রানি চুপ হয়ে গেলেন। জামাইয়ের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হলেন মুখ খুলতে।

-তা হলে শোনো! তোমার আব্বু ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। তিনি আমাদের রাজ্য দখল করার জন্যে হানা দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম। তোমার শ্বশুর শেষে একটা প্রস্তাব দিলেন, আমরা তাকে নিয়মিত কর দিয়ে যাব। আর আমাদের মেয়েটা বড় হলে, তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব! তোমার আব্বু মেনে নিলেন প্রস্তাবটা। তবে একটা শর্ত দিলেন।

আমাদের রাজ্যে একদল 'জিপসি' বাস করত। অনেকদিন ধরেই তারা এখানে আছে। এই দেশ তাদের কাছে ভালো লেগে যাওয়াতে, অন্য কোথাও যাওয়ার চিন্তা করেনি। আমাদের সেনাবাহিনীতেও জিপসি যুবকেরা যোগ দিতে শুরু করেছিল। তারাই ছিল আমাদের সেরা দল। তোমার আব্বুর শর্তটা ছিল, আমাদের রাজ্য থেকে এই জিপসিদের উচ্ছেদ করতে হবে। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি তাকে এই শর্ত থেকে টলাতে। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। বাধ্য হয়ে উচ্ছেদ-অভিযানে নামতে হলো। অভিযানের সময় এক সন্তানসম্ভবা মা একটা কন্যাসন্তান প্রসব করেই মারা গেল। সৈন্যরা সদ্যোজাত মেয়েটাকে নিয়ে এল। মাত্র দুদিন আগে আমাদের মেয়েটা আকস্মিকভাবে মারা গিয়েছিল। কী এক রোগ হয়েছিল রাজবৈদ্য ধরতে পারেনি। আমি জিপসি কন্যাকেই কোলে তুলে নিলাম। তোমার স্ত্রী হচ্ছে আমার সেই পালিতা কন্যা। কিন্তু সে আমার রক্তের কন্যার চেয়েও বেশি। কেন বাবা এতদিন পর এই খোঁজ-খবর? সেকি তোমার সাথে কোনো বেয়াদবি করেছে!

-তৌবা তৌবা, আপনার মেয়ে অত্যন্ত ভালো মেয়ে! তার তুলনা সে নিজেই! আপনি চিন্তা করবেন না আম্মাহুজুর! আমি ভিন্ন এক কারণে খোঁজ-খবর করছি!

***

রাজা ফিরে এলেন নিজ রাজ্যে। সিয়াসিকে আনালেন।

-তুমি কীভাবে বুঝতে পারলে ব্যাপারটা?

-রানিমা কথা বলার সময় বিশেষ ভঙ্গিতে 'চোখ' নাচিয়ে কথা বলেন। এমনটা সাধারণত জিপসি মেয়েরা করে। তারা ভ্রু-ভঙ্গি ছাড়া কথা বলতেই পারে না। চোখেমুখে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

-বাহ! তুমি তো বেশ জ্ঞানী দেখছি! তুমি আজ থেকে আর সায়িস নও, তুমি হবে আমার খাস সিয়াসি। উজির। প্রহরী সিয়াসিকে নিয়ে যাও! তার জন্যে তিন বেলাই বকরি যবেহ করে খানাপিনার বন্দোবস্ত করে দাও।

***

সিয়াসির কাছে রাজ দরবারে বন্দী হয়ে চাকরি ভালো লাগল না। সে হলো ফ্রি-ল্যান্স সিয়াসি। একটা দলের হয়ে সিয়াসতগিরি করা তার পোষাবে না। মন বসবে না। সে রাতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ফ্রি-ল্যান্সার চুপি চুপি পালাতে উদ্যত হলো। রাজতোরণ দিয়ে বের হতেই প্রহরীরা তাকে পাকড়াও করে জেলে পুরল। সকালে রাজার সকাশে হাজির করল।

-কী সিয়াসি, পালাচ্ছিলে কেন?

-জাহাপনা! বন্দীজীবন আমার ভালো লাগে না। আর...!

-আর কী?

-অভয় পেলে বলতে পারি!

-অভয় দিলাম।

-হুজুর আগেও অভয় দিয়েছিলেন, তারপরও...!

-আচ্ছা, এবার যাই বলো, কিছু করব না।

-হুযুর আমার ইচ্ছা ছিল একজন সত্যিকার রাজপুত্রের কাছে কিছুদিন থাকব! সে আশাতেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আশা পূরণ হলো না।

-আমাকে তোমার সত্যিকার 'প্রিন্স' মনে হয় না!

-ইয়ে মানে, কী বলব! জি মনে হয় না!

***

রাজা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু পাক্কা ওয়াদা দিয়েছেন। কিছু করতেও পারছেন না। তড়াক করে সিংহাসন থেকে উঠে অন্দরমহলে গেলেন গটগটিয়ে।

-আম্মিজান! আম্মিজান!

-কী বাবা!

-আমি আপনার পুত্র নই?
-এ কেমন কথা, তুই আমার পুত্র না হলে আর কে হবে?
-নাহ, আম্মু সত্যি সত্যি বলো! আমি কার পুত্র!
-আচ্ছা আচ্ছা বলছি শোন! তোর বাবা ছিলেন অত্যন্ত নির্দয় স্বভাবের। তার ছিল পুত্রসন্তানের বেজায় শখ। কিন্তু তার কোনো সন্তান হচ্ছিল না। সন্তান জন্ম দিতে না পারলেই নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেলে আরেক বিয়ে করছিলেন। এভাবে পুরো রাজ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। ঘটনা গড়াতে গড়াতে আমি পর্যন্ত এসে ঠেকল। আমি প্রথম রাতেই একটা বুদ্ধি করলাম। বিয়ের কয়েকদিন পর থেকেই ভাব করলাম, আমি সন্তানসম্ভবা হয়েছি। তোর বাবা বেজায় খুশি! যখন থেকে শরীর ভারী হতে শুরু করে, তখন তোর বাবাকে বললাম, এ সময়টা মায়ের কাছে থাকা ভালো। তিনি সানন্দে রাজি হলেন। মাঝেমধ্যে দেখতে যেতেন। তখন আমি অভিনয় করতাম, আমার বাচ্চা হবে। তিনিও খুশিমনে ফিরে আসতেন। বেশিক্ষণ তো থাকতেন না, তাই তাকে বুঝ দেয়া কঠিন কিছু ছিল না।
-তা হলে আমি কোত্থেকে এলাম!
-সেটাই বলছি। আমার একান্ত পরিচিত একটা পরিবার ছিল। অত্যন্ত গরিব। তাদের সন্তান হবে। আমি তাদের সাথে চুক্তি করলাম। তারা আমাকে সন্তানটা দিয়ে দেবে।
-পুত্র না কন্যা সেটা কীভাবে বুঝলে!
-এটা অবশ্য অনিশ্চিত ছিল। তবুও ঝুঁকি সত্ত্বেও এ পথেই আগে বাড়লাম। যথাসময়ে তুই ভূমিষ্ঠ হলি। আমি তোকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরলাম।
-আমার সেই জন্মদাত্রী মা কোথায়?
-তিনিও এই প্রাসাদেই থাকেন। তিনিই তোকে দুধ খাইয়েছেন। তোকে লালন-পালন করেছেন। তুই যাকে ধাই মা বলে ডাকিস, তিনিই তোর আসল মা। তিনি ছিলেন ভালো রাঁধুনি। তাই তাকে আমি প্রাসাদের প্রধান রাঁধুনির চাকরি দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে এসেছিলাম। এতে সবদিক সামাল দেয়া গিয়েছিল। তিনিও সন্তান হারালেন না। আমিও প্রাণে বেঁচে গেলাম। আরও অনেক নারীও বেঁচে গেল। তোর আঁটকুড়া বাবাও শান্ত হলেন। রাজ্যও উৎসন্নে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল।

***

রাজা চিন্তিত মনে দরবারে এলেন। সিয়াসি তখনো বসা।
-তুমি কীভাবে বলতে পারলে, আমি সত্যিকার রাজপুত্র নই?

-জাহাপনা! আমি শুরু থেকেই দেখে এসেছি, আপনি পুরস্কার দেন আর তিরস্কার করেন, সবই খাবারের ওপর দিয়েই যায়। প্রথমে দিলেন চাল-ডাল-ঝোল দিয়ে পুরস্কার। পরে দিলেন খাবার বন্ধ করে তিরস্কার। এরপর আবার খাবার দিয়ে পুরস্কার। একজন বংশগত রাজকুমার এত অল্প কিছু দিয়ে পুরস্কার দিতে পারে? এতকিছু থাকতে শুধু খাবার দিয়ে?

জীবন জাগার গল্প : ৬৬২

কালিমাতু হাক্ক

দেশের রাজা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। জুলুম-নির্যাতন তো করছেই, আচার-আচরণেও আল্লাহবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এমন স্বৈরাচারী শাসককে কিছু বলার মতো কেউ নেই। দিন দিন রাজা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছেন।

★★★

একজন আলিম আর সহ্য করতে পারলেন না। অন্যরা চুপ করে থাকলেও তার বিবেকে বাধছিল। এভাবে কিছু না বলে আর থাকা যায় না। যা হয় হোক, তিনি সরাসরি রাজার দরবারে চলে গেলেন। অনুমতি নিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে বললেন :

-আপনি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সত্যচ্যুত হয়ে গেছেন। এমনকি কিছু কাজ রাষ্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর তো বটেই ধর্মবিরোধীও হয়ে গেছে!

★★★

রাজা প্রহরীদের হুকুম দিলেন আলিমকে বন্দী করতে। একসময় সবাই আলেমের কথা ভুলেই গেল। সাত বছর পর কী এক প্রসঙ্গে আলিমের কথা রাজার মনে পড়ল। দরবারে হাজির করতে বললেন।

-আপনি বেঁচে আছেন এখনো?

-হায়াত-মওত আল্লাহর হাতে।

-আপনি এখনো আগের অবস্থানে আছেন?

-ওটা তো আমার অবস্থান নয়!

-কার?

-আল্লাহর। আমি শুধু বাহক মাত্র। পৌঁছে দিয়েছি।

-আপনি সেদিন বড়ই কর্কশভাবে কথা বলেছিলেন আমার সাথে। রাজার সম্মান বজায় রাখতে পারেননি।

-আমি একজন ডাক্তার! যেখানে ছুরি চালাতে হবে, সেখানে সুঁই চালালে হবে? নরম-কঠোর এটা হলো আপেক্ষিক!

-আমাকে ওয়াজ করার দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে?

-আপনাকে এই রাজ্যের শাসনভার কে দিয়েছে?

-আমার আগের রাজা!

-আমাকেও আমার রব এই দায়িত্ব দিয়েছেন!

-আপনার কি একথা জানা ছিল না, সরকারের সাথে টক্কর দিতে আসা মানে, নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া?

-আপনারও কি একথা জানা নেই, কেউ আল্লাহর সাথে টক্কর দিতে আসা মানে, নিজেকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া হয়?

-আপনার মতো কথা অন্য আলেমরা তো কোনো দিন আমাকে বলেনি!

-তারা সাত বছর জেল খাটার ভয়ে বলেনি!

-আপনার ভয় ছিল না?

-আমি ইউসুফ আ.-এর আদর্শ অনুসরণ করেছি। আপনার জুলুমকে চুপ করে সহ্য করার চেয়ে সিজন (জেল)-কে প্রাধান্য দিয়েছি!

-আমার কাছে আপনার কোনো কিছু চাওয়ার আছে?

-আমার জেলে কাটানো বিগত সাতটি বছর ফিরিয়ে দিন!

-সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি সাধ্যাতীত বিষয় চেয়েছেন!

-তা হলে আমাকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে দিন!

-এটা কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? আপনি আজ আমার কাছ থেকে কিছু না নিয়ে যেতে পারবেন না!

-ঠিক আছে! আপনার পাশে যে কালো রঙের পরিচারক দাঁড়িয়ে আছে, আমি তার কাছ থেকেই কিছু একটা নিয়ে যেতে চাই। যদি সে দেয় আরকি!

-আপনি আমার কাছে না চেয়ে একজন সাধারণ চাকরের কাছে চাচ্ছেন? আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে নাকি!

-দেখলেন তো! চাকরের কাছে চাওয়াতে আপনি রেগে গেলেন! একটু ভেবে দেখুন তো! আমি আল্লাহর কাছে না চেয়ে, তাঁর একজন নগন্য বান্দার কাছে চাইলে তিনি কেমন রাগটা করবেন?

-তারপরও বলছি, আপনি আমার কাছে কিছু একটা চেয়ে নিন!

-ঠিক আছে, আপনি তিন বস্তা গম নিজে পিঠে বহন করে অমুক স্থানে পৌঁছে দিন!

-এতগুলো গম আমি কীভাবে বহন করব?

-আপনি মাত্র তিন বস্তা গম বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করছেন, তা হলে পুরো দেশের মানুষের ওপর করা জুলুমের বোঝা কীভাবে বহন করবেন?

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৩

হিজাবী

-দাদু! অনেক দিন ধরে একটা চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে!

-তোর মাথায় একটা চিন্তা কেন, হাজার হাজার চিন্তাই তো সারাক্ষণ কিলবিল করতে দেখি!

-না দুষ্টুমি নয়, সত্যি সত্যি বলছি!

-তা শুনি তো সেই যুগান্তকারী চিন্তা!

-আমার বান্ধবীদের মধ্যে একটা বিষয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে!

-বিষয়টা কী?

-হিজাব!

-তোকে হিজাব পরতে নিষেধ করে?

-না বিতর্ক হিজাব পরা না-পরা নিয়ে নয়!

-কী নিয়ে?

-দুই মেয়েকে নিয়ে।

একজন হিজাব পরে। হাতমোজা পা-মোজাও পরে। কিন্তু সবই বাইরে বাইরে! ভেতরে ভেতরে হেন অপকর্ম নেই যা সে করে না। প্রেম করা থেকে শুরু করে সবকিছু! নামায-কালামেরও ধার ধারে না।

আরেকজন খুবই সুন্দরী। হিজাব পরে না। কিন্তু অত্যন্ত শালীন তার চলাফেরা। ভদ্র-মার্জিতা। কারও সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। নামায-কালামও যথাসাধ্য করার চেষ্টা করে!

জানার বিষয় হলো, দুই মেয়ের মধ্যে কে বেশি ভালো?

-বড় জটিল প্রশ্ন করলি রে! যে মেয়েটা শরয়ী হিজাব পরে কিন্তু তাকওয়া অবলম্বন করে না, সে হলো পানিবিহীন ফুলের মতো। তসরষহীন গাছের

মতো! দেখতে তরতাজা মনে হলেও, ভেতরে কোনো 'সার' নেই। যেকোনো সময় শুকিয়ে যেতে পারে।
যে হিজাব মনের তাকওয়া থেকে উৎসারিত নয়, সেটার স্থায়িত্ব বেশিদিনের জন্যে নয়। এই হিজাব স্বার্থপ্রসূত। লোক দেখানো। পারিবারিক চাপের কারণে।

আর যে মেয়ে মনে মনে তাকওয়ার অধিকারী অথচ হিজাব পরে না, সে হলো শরবতের গ্লাসের তলায় জমে থাকা অতিরিক্তি চিনির মতো। চিনিগুলো দেখা যায়, কিন্তু শরবতকে মিষ্টি করার পেছনে তার কোনো ভূমিকা নেই।
ভেতরে তাকওয়া থাকলে, সেটা তো বাইরে প্রকাশ পাবে। আচরণে-পোশাকে। প্রকৃত মুত্তাকী হলে সে কীভাবে হিজাব ছাড়া চলতে পারে? প্রথমজনকে যদি আমি ধূর্ত বলি দ্বিতীয়জনকে বলব 'নির্বোধ'।

যে সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভয় করে, সে হিজাবও পড়বে। শরীয়তের দৃষ্টিতে দুজনের কাউকে নিরঙ্কুশ ভালো বলা মুশকিল! প্রথমজন হিজাব পরার সওয়াব পাবে। তাকে দেখে অন্য কেউ গুনাহে লিপ্ত হবে না। তার রূপের মোহে পড়ে কোনো মূঢ় যুবক আকাশ-কুসুম কল্পনা করবে না। অন্যায় কোনো দাবি-দাওয়া তোলার সুযোগ পাবে না। সে আড়ালে গুনাহ করলে, তার জন্যে আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে। তবে হিজাব পরার ভালোটুকুর স্বীকৃতি তাকেই দিতে হবে। তার রূপের আগুনে দগ্ধ হয়ে বোকা যুবকের দল বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ পাবে না, এটুকু ভালো মানতেই হবে।

দ্বিতীয় মেয়েটা নিজে নিজে ভালো। সেটা প্রশংসনীয়। সওয়াব পাবে। কিন্তু উদ্ভিন্ন যৌবনের মোহে পড়ে রাস্তার অসংখ্য যুবক-বৃদ্ধ গুনাহের চিন্তায় বিভোর হচ্ছে, তার দায়ভার তো তাকে নিতেই হবে।

প্রথমজনের গুনাহ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা আশেপাশে দুয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। দ্বিতীয়জনের গুনাহ রাস্তায় হাঁটাচলা করা প্রায় সবার মাঝেই ছড়িয়ে পড়ছে!
সারকথা, দুজনের কেউই নিরঙ্কুশ ভালো নয়। সামাজিক বিচারে দ্বিতীয়জনের গুনাহ বেশি মারাত্মক। ব্যক্তিগত বিচারে অবশ্য প্রথমজন পিছিয়ে পড়বে! উভয়টার সমন্বয় করা মেয়েই সেরা। বেশি উত্তম! আল্লাহর কাছে প্রিয়। তাকেই মুত্তাকী বলা যাবে। মনের তাকওয়াই যথেষ্ট

নয়। তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশও জরুরি। আর যে তাকওয়ার প্রকাশ্য কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, সেটা তাকওয়াই নয়।

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৪

আমরা ও তারা!

দশটি শিশুকে দশটা চেয়ার দেয়া হলো। বৃত্তাকারে। সবাইকে ঘুরতে বলা হলো। বাঁশি বাজালে বসে পড়তে হবে। যে চেয়ার পাবে না, সে বাদ পড়বে। পরের বার একটা চেয়ার কমিয়ে ফেলা হবে। আগের মতো সবাই চক্রাকারে ঘুরবে। বাঁশি বাজলে বসে পড়বে। চেয়ার না পাওয়া শিশুটি খেলা থেকে বাদ পড়বে। আবার একটা চেয়ার কমিয়ে খেলা শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকবে সে-ই বিজয়ী হবে!

= খেলতে গিয়ে ছেলেরা শিখবে, আমাকে একটা চেয়ার পেতেই হবে। অন্যকে ধাক্কা দিয়ে হলেও। আরেকজনকে হটিয়ে হলেও আমার টিকে থাকা চাই!

***

এটা আমাদের আশেপাশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গড়পড়তা ঘটনা। এবার জাপানের একটা কিন্ডার গার্টেনের কথা বলা যাক। তারাও হুবহু একই খেলাই খেলে। তবে সম্পূর্ণ উল্টো করে।

দশটি শিশুকে দেয়া হয় নয়টা চেয়ার। সবাই চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘোষণা থাকে, কোনো একজন বসতে না পারলে, সবাই খেলায় হারবে। ক্রমান্বয়ে চেয়ারের সংখ্যা কমতে থাকে। প্রতিবারই সবার প্রাণপণ চেষ্টা থাকে, একজন সাথীও যেন চেয়ারবিহীন না থাকে! চেয়ার কমলেও সবাই চেষ্টা করে যেতে থাকে, সবাই যেন বসতে পারে!

= কচি শিশুদের মনে একটা কথা গেঁথে যায়, অন্যকে বঞ্চিত করে নয় অন্যকে নিয়েই জিততে হবে। না হলে আমিই হেরে যাব।

***

আমাদের শিশুদের শিক্ষা দেয়া হয় কীভাবে পরীক্ষায় প্রথম হতে হবে। অন্যের চেয়ে নম্বর বেশি পেতে হবে। অন্যের চেয়ে কীভাবে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে থাকতে হবে।

আমাদের শিশুদের মানসগঠন প্রক্রিয়াটা খুবই ভঙ্গুর আর অবিবেচনাপ্রসূত। বাবা-মা শুধু উপদেশ দেয়। নিজেরাই যে সন্তানের জন্যে জীবন্ত উপদেশ হতে পারে, সেদিকে খেয়াল থাকে না।

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৫

পাগলা পানি

দেশে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। একমাত্র নদী, যার পানি দিয়ে দেশের চাষাবাদ চলে, রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, পানাহার চলে, সে পানিতে ভিন্ন এক প্রভাব দেখা দিল। যারাই সে নদীর পানি খাচ্ছে, পাগল হয়ে যাচ্ছে! প্রথম দিকে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি, সবাই ভেবেছিল অন্য কোনো কারণে তারা পাগল হয়ে যাচ্ছে। সাময়িক ব্যাপার। স্থায়ী কিছু নয়। অস্থায়ী। দুয়েক দিন পর কেটে যাবে। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ঘটে চলল উল্টোটা। ক্রমে ক্রমে পাগলের সংখ্যা বাড়তেই থাকল।

***

পুরো দেশে ভয় ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ পানি পান করা বন্ধ করে দিল। কিন্তু পানির বিকল্প উৎস না থাকাতে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে নদীর পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছে। প্রতিসকালেই দেখা গেল আগের তুলনায় পাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে।

রাজা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এর সমাধান কী হবে? বিশেষ রাজ-মহাসভার ডাক দিলেন। কোনো সমাধান বের হওয়া ছাড়াই প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হলো। পরদিনের জন্যে মুলতবি ঘোষণা করা হলো। পরদিন সকালে রাজা উঠে দেখল, প্রাণাধিকা রানিও জনগণের পথে পা বাড়িয়েছে। দেশের নতুন করে হওয়া পাগলরা, আগের ভাষা ভুলে বিশেষ এক ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছে। রানি প্রাসাদ থেকে গোপনে পালিয়ে পাগল-দলে যোগ দিয়েছে। অবস্থা দিন দিন গুরুতর আকার ধারণ করতে শুরু করল। রানির বিরহে রাজা পাগল হওয়ার দশা! শত চেষ্টা করেও রানিতে প্রাসাদে তুলে আনা গেল না। আনতে গেলে অন্য পাগলরা খেপে যায়। তাদের উদ্ভট ভাষায় প্রতিবাদের ঝড় তোলে।

***

পরদিন রাজা আগে আগেই দরবারে এলেন। তখনো কেউ এসে পৌঁছায়নি। এমনটা কখনো হয় না। রাজা অবাক হলেও কিছু বলার উপায় নেই। একটু পর হন্তদন্ত হয়ে প্রধান উজির এল। হাউমাউ করে বলল :

-জাহাঁপনা! সর্বনাশ হয়ে গেছে!

-সর্বনাশ হতে আর বাকি আছে কিছু? তা কী হয়েছে?

-রাজ্যের প্রায় সবাই পাগল হয়ে গেছে। এমনকি মন্ত্রিপরিষদের সবাই। সবাই এখন উল্টো বকছে!

-কেমন?

-তারা বলছে, আমরা যারা এখনো পাগল হইনি, তারাই নাকি মূলত পাগল!

-আমরা পাগল হলে তারা কী?

-তারা নাকি ভালো। তারা পাগলা নদীর পানি পান করার আগে তারাও পাগল ছিল, সুস্থ হওয়ার জন্যেই নদীর পানি পান করেছে। এখন তারা পুরোপুরি সুস্থ। পাগলামি থেকে বাঁচার জন্যে তারা আরও বেশি পরিমাণে পানি পান করছে।

-বড্ড চিন্তায় ফেলে দিলে দেখছি! পুরো রাজ্যে শুধু আমরাই সুস্থ আছি?

-কী জানি, এতক্ষণে হয়তো বাকিরাও অন্যদের পথ ধরেছে!

-তা হলে আমরাও কি তাদের পথে পা বাড়াব? প্রজারা পাগল হলে, আমি ভালো থেকে আর কী করব? প্রজাদের হাবভাব বুঝতে না পারলে আমি রাজা থেকেই বা কী লাভ!

-আওেশ দিন ভেবে দেখুন বিষয়টা!

-নাহ, আর ভাবাভাবির কাজ নেই! দাও, দুজনে পাগল হয়ে যাই!

***

রাজা পাগল হয়ে যাওয়ার পর প্রথমেই উজিরকে পাগল বলে গালি দিল, বিদ্রূপ করতে শুরু করল। উজির পানির গ্লাস হাতে বসে রইল। ঝিম ধরে। ভাবনার অতলে হারিয়ে গেল। কী করবে? একবার ভাবে, কী আর হবে, সবার যে গতি আমারও সেই গতি হবে! হোক না সেটা দুর্গতি! আরেকবার থমকে গিয়ে ভাবে, নিজের এতদিনকার অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধিকে এভাবে ভাসিয়ে দেব! সবাই পাগল হয়েছে তো কী হয়েছে! চারদিকে পাগলদের তাণ্ডব দেখে আবার ভাবনায় পড়ে যায়, একা সুস্থ থেকে কী করবে? সবাই তো তাকেই পাগল ঠাওরাচ্ছে!

***

প্রশ্ন হলো : এখন উজিরের কী করণীয়? সঠিক সিদ্ধান্তটা বেছে নেয়া বড্ড কঠিন! নিজের তৃপ্তি-সন্তুষ্টি যদি আশেপাশের সবার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে পড়ে অথবা নিজের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য আশেপাশের অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু হয়ে পড়ে, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে, নিজেকে

পরিস্থিতির কাছে সোপর্দ করে গ্লাসে চুমুক দেবে? নাকি নিজের পথে পা বাড়াবে? শান্তিতে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেয়ার জন্যে পানিতে মুখ দেবে নাকি আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্যে গ্লাসটা ছুড়ে মারবে?

★★★

কেউ যদি বলে :

-অমুক অমুক অমুক এত বড় বড় মানুষ হয়ে ভুলের ওপর আছে, শুধু তুমিই সত্যের ওপর আছ? পুঁচকে তুমিই কেবল হক চিনেছ তারা চিনতে পারেনি?

= তা হলে তোমাকে বুঝে নিতে হবে, লোকটা তোমার সামনে একটা 'গ্লাস' রেখেছে! পান করবে কি না ভেবে দেখো!

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৬

সুখী মানুষ

-হুযুর, আমি সুখী হতে চাই

-সে তো খুবই খুশির খবর। খুবই সহজ একটা কাজ! হাতের মোয়া!

-এত সহজ হলে আমি সুখী হতে পারছি না যে? কীভাবে সুখী হব?

-আচ্ছা! কল্পনা করে বলো তো, তোমার বিগত জীবনে কোনো সুখময় স্মৃতি নেই?

-সে তো অনেক আছে। কিন্তু এখন এমন সংকটে আছি যে, কিছুতেই মনে সুখ খুঁজে পাচ্ছি না।

-আসলে তুমি সুখকে কঠিন অসম্ভব বস্তু ভেবে বসে আছ বিধায়, সুখটা অধরা থেকে যাচ্ছে। না হলে, সুখ খুবই সহজলভ্য একটা বিষয়। আমি তোমাকে সুখী হওয়ার কয়েকটা সহজ পথ বাতলে দিচ্ছি।

এক. একজন মানুষ এমন থাকা দরকার, যে তোমাকে ভালোবাসবে। সে হতে পারে বন্ধু বা ভাই বা স্বামী বা স্ত্রী বা মাতা-পিতা। যে তোমার ভালো চাইবে। তুমি দূরে কোথাও গেলেও তোমার মনে স্বস্তিবোধ থাকবে, ভরসা থাকবে, তোমাকে নিয়ে কেউ একজন ভাবছে। তোমার আশায় কেউ একজন প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে।

দুই. ক্ষমা করতে শেখো। তোমার প্রতি যে মন্দ আচরণ করে, তাকে মাফ করতে অভ্যস্ত হও। তোমার অধিকার যে কেড়ে নেয়, তাকে ছাড় দিতে শেখো। কথাপ্রসঙ্গে বা ম্যাসেজ/চিঠির মাধ্যমে সেটা তাকে জানিয়ে দাও। এটাও তোমার মনে সুখবোধ সৃষ্টি করবে।

তিন. ছেলেবেলায় পরম আনন্দে করতে, এমন কোনো কাজ বা খেলার কথা স্মরণ করো। সেটা আবার করে দেখতে পার।

আরেকজনকেও একথাটা বলেছিলাম। সে জানিয়েছিল, ছেলেবেলায় তার সাইকেল চালাতে খুবই ভালো লাগত। সে একটা সাইকেল কিনে প্রতিদিন চালাতে শুরু করল। তার মনের অবস্থা বদলে গেল।

চার. তোমার প্রিয় কোনো বই পড়তে পার। হাসির বই। কান্নার বই। ভয়ের বই। মজার বই। যেটা তোমার ভালো লাগে।

পাঁচ. তোমার প্রিয় কোনো মানুষকে উপহার দিতে পার। কী উপহার দেবে, সেটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো। কোত্থেকে কিনবে, কীভাবে কিনবে, সেটা নিয়ে পরিকল্পনা সাজাও। দেখবে কিছু সময়ের জন্যে হলেও নিজেকে সুখী মনে হবে।

ছয়. মাঝেমধ্যে শিশুদের সাথে কিছু সময় কাটাও। খেলা করো, তাদের মতো করে কথা বলো, তাদের মতো করে চিন্তা করো। দেখবে তোমার ভালো না লেগে পারবেই না।

সাত. নিজের ব্যক্তিগত ট্রাংক, আলমারি, বুকসেলফ, জামাকাপড় গুছিয়ে রাখো। অপ্রয়োজনীয় জামা-কাপড় দান করে দাও। মনটা অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে।

আট. অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর সাথে সময় কাটাও। যার সাথে কথা বলতে তোমার ভালো লাগে। আরাম লাগে। স্বস্তি লাগে। সময় করে তাকে সাথে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসতে পার।

নয়. অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশিই ঘুমুতে পার। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে। মনটা ফুরফুরে হয়ে যাবে।

দশ. মাঝেমধ্যে ব্যায়াম করতে পার। একটুখানি সাঁতার। সামান্য দৌড়াদৌড়ি। একটুখানি খেলাধুলা। একটুখানি লাফালাফি। ভালো না লেগে পারে?

এগারো. মা-বাবার সাথে কিছু সময় কাটাও। তারা ছেলেবেলায় কত কষ্ট করেছেন, সেটা চিন্তা করো। এখন তারা গ্রামের বাড়িতে বা নিজের কাছে কতটা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটায়! এর চেয়ে ভালো সময় আর কিছু হতে পারে?

বারো. বেশি বেশি মুচকি হাসির অভ্যেস গড়ে তোলো। রীতিমতো অনুশীলন করো। চর্চা করো। কসরত করো। এটা মনের ওপর প্রভাব ফেলবেই!

তেরো. কবর জিয়ারত করো। আপনজনের। পরজনের। চেনার। অচেনার। শুনতে অদ্ভুত শোনালেও, আসলেই কবর জিয়ারত করলে, মন ভালো হয়ে যায়। কবরের কথা মনে আসে। আখিরাতের কথা স্মরণে আসে। দুনিয়ার তুচ্ছ ঝুট-ঝামেলাকে তুবড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার মতো পলকা মনে হবে।

চৌদ্দ. বয়স্ক-মুরুব্বি-অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে কিছু সময় কাটাতে পার। তাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা অল্প খরচেই অর্জন করা যাবে। অনেক না জানা অধ্যায় উন্মোচিত হবে। নিজেকে আর অসহায় মনে হবে না। অন্যের অভিজ্ঞতায় নিজের পথ চলা সহজ হয়ে যাবে।

পনেরো. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করো। তিনি যেন তোমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন। মনকে সুখী করে দেন।

-আচ্ছা, সুখী হওয়া তা হলে এত সহজ? ঠিক আছে দেখছি!

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৭

সদকা

মানুষটার শরীরে দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর রোগ ধরা পড়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন অপারেশন করতে হবে। বাঁচার আশা পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। বেচারা বিষণ্নবদনে ঘরে ফিরে এল। শেষবারের মতো বিদায় নেবে। বাঁচলে দেখা হবে, না হলে ক্ষমা। বাজারে এক বন্ধুর দোকান। ছেলেবেলার বন্ধু। শেষ দেখা না দিয়ে গেলে মনে আক্ষেপ থেকে যাবে। অপারেশন কেমন হবে আল্লাহই জানেন। তবুও আগেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখাই ভালো।

***

বন্ধুকে সব খুলে বলল। দুজনেই ভীষণ মন খারাপ করে বসে আছে। পাশেই কসাইখানা। পরপর বেশ কয়েকটা গোশতের দোকান। মানুষজন ভিড় জমিয়ে গোশত কিনছে। দুদিন পর বিশেষ এক উৎসব। সে উপলক্ষে একটু ভালোমন্দ খাবে সবাই। অসুস্থ বন্ধুর মনে হাহাকার! সবাই যখন

উৎসবের আনন্দে মেতে উঠবে, সে তখন অপারেশন থিয়েটারে অথবা কেবিনে! কী নির্মম পরিহাস! এসব ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ল এক মহিলার ওপর। কসাইদের গোশত কাটার মাচার নিচ থেকে গোশত ও হাড্ডির কুচা খুঁজে খুঁজে কুড়িয়ে নিচ্ছে। দৃশ্যটা খুবই কষ্টদায়ক! এত মানুষ গোটা গোটা গোশত কিনে বাড়ি ফিরছে, আর একজন গরিব মহিলা গোশতের 'কণা' খুঁজছে!

***

মানুষটা এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে মহিলাকে আস্তে করে প্রশ্ন করল :
-আপনি গোশতের কুটোগুলো কেন কুড়োচ্ছেন?
-কী আর করব, কেনার সামর্থ্য নেই! মেয়েরা বায়না ধরেছে গোশত খাবে। অনেক দিন ধরে গোশত খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। তাই ভাবলাম কুটোকাটা যা কুড়িয়ে পাই, সেটা দিয়ে ট্যালট্যালে ঝোল রান্না করে দেব। অন্তত গোশতের ঘ্রাণ হলেও তো কিছু জুটবে!

***

মানুষটার মন ভীষণ আর্দ্র হয়ে উঠল। মনের খারাপ লাগা আরও বেড়ে গেল। একজন কসাইকে বলল :
-ভাই, এক কেজি গোশত মেপে দিন।
মহিলা না না করে উঠল। তবুও জোর করে তার হাতে গোশতের ব্যাগ ধরিয়ে দিল। তারপর বন্ধুর মুদি দোকানে গিয়ে অন্যান্য বাজার সদাই করে দিল। মহিলাকে সাক্ষী রেখে বন্ধুকে বলে দিল :
-এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে এক কেজি গোশত কিনে দেবে। সাথে অন্য বাজারও দিয়ে দিয়ো।
মহিলা ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠল। এতটা সে আশা করেনি। আর সে ভিক্ষুকও নয়। তাই সংকোচে মরে যাচ্ছিল।

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৮

মাড়াই-ঝাড়াই-বাছাই

আমরা প্রতিদিন ঘর ঝাড়ু দিই। বিছানা ঝাড়ু দিই। উঠোন ঝাড়ু দিই। বইপত্র ঝাড়ি। দোকান-পাট ঝাড়ি। আলনা ঝাড়ি। আরও অনেক কিছু ঝাড়ি।

***

ধান কাটার পর গরু-হাত বা মেশিন দিয়ে মাড়াই। খেতের আগাছা নিড়াই। গোলাবের কাঁটা বাছি। রস পাওয়ার জন্যে খেজুর গাছ কাটাই।

নারকেলের ফলন ভালো হওয়ার জন্যে গাছিকে খবর দিয়ে আনি। গাছটা পরিষ্কার করে দেয়। পরের বছর আরও বেশি নারকেল ধরে।

***

বড়লোকেরা ফি বছর শরীরের থরো চেকআপ করান। আগাগোড়া। এজন্য কেউ সিঙ্গাপুর, কেউ চেন্নাই, কেউ-বা ব্যাঙ্গালোর, আবার কেউ ব্যাংকক চলে যান। ব্রিটেন-আমেরিকাও কেউ কেউ যান। শরীরের কোথাও কোনো সমস্যা আছে কি না, সচেতন থাকেন।

***

কিছুদিন পর পরই নিজের গাড়িতে নিত্য-নতুন সব পার্টস যোগ করেন। নতুনত্ব আনেন। ধোঁয়ার পাইপটা নতুন করে লাগান। এয়ারকন্ডিশন সিস্টেমটা বদলে ফেলেন। টায়ারটা ক্ষয় হয়ে গেছে, নতুন ডানলপ-টাটা টায়ার ফিট করেন। গিয়ারটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, অটো গিয়ার যোগ করেন।

***

কম্পিউটারটার মডেল পুরোনো হয়ে গেছে। স্যালারন। এবার কোর-সিরিজের একটা নতুন ব্র্যান্ড না হলে চলছেই না।

মোবাইলটা সেই আদ্দিকালের। এবার একটা অ্যান্ড্রয়েড সেট না নিলে মান থাকবে? সময় করে মোতালেব প্লাজা বা বসুন্ধরায় না গেলেই যে নয়।

মোটর সাইকেলটা সেই পুরোনো হিরো! এবার একটা বিএমডব্লিউ না হলেও, নতুন কিছু একটা তো নিতেই হবে। না হলে যে মান থাকবে না।

সেলুনে গিয়ে নতুন কোন স্টাইল বাজারে চলছে, সেভাবেই চুলটা না কাটলে কেমন দেখায়? সামনে বড় বড় চুলের দিন শেষ, এবার পেছনে বড় বড়।

***

ঘরের পর্দা বদলাই। বিছানা চাদর বদলাই। মুহূর্তে-মুহূর্তে টিভির চ্যানেল বদলাই। শীতের কাপড় বদলাই। পরনের জামা বদলাই। চশমার ফ্রেম বদলাই। পারফিউমের সুবাস বদলাই। কর্মক্ষেত্র বদলাই। দেশ বদলাই। শহর বদলাই। বাসা বদলাই। আরও কত কী যে বদলাই! এমনকি বউ-জামাই পর্যন্ত বদলে ফেলি!

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটো বিষয়, সেগুলো বদলাই না। বদলাতে চাই না।

= চিন্তা ও আমল।

আমরা নিজেদের চিন্তা নিয়েই তুষ্ট থাকি। তৃপ্ত থাকি। যা ভাবছি, সেটা ঠিক আছে কি না, যাচাই করতে প্রবৃত্তি হয় না। আমার অবস্থানটা ঠিক আছে কি না মেপে দেখি না।

এতদিন যা ভেবে এসেছি, সেটা আজও ঠিক হবে, এমনটা ভাবা তো ঠিক নয়। হ্যাঁ, কিছু বিষয় থাকে স্বতঃসিদ্ধ, সেসবের কথা ভিন্ন। কুরআন-হাদীসের বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে একটা নির্দিষ্ট মতের ওপর অটল থাকা সবক্ষেত্রে যৌক্তিক নাও হতে পারে!

***

চিন্তাকে মাপার জন্যে কী করা যেতে পারে?

ক. কিছুদিন পর পরই, আমার চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে এগিয়ে থাকা মানুষের সাথে নিজের চিন্তাকে মিলিয়ে দেখা!

খ. বিপরীত চিন্তাকে প্রথমেই বিরূপভাবে না নিয়ে, যাচাই করার মনোভাব নিয়ে দেখা যেতে পারে।

গ. সঠিক চিন্তা পাওয়ার জন্যে, আল্লাহর কাছে নিয়মিত দোয়া করা।

ঘ. চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফ পড়া।

ঙ. আমিই ঠিক, এমন প্রান্তিক চিন্তা মনে ঠাঁই না দেয়া।

***

আমরা নিজেদের আমলের উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করতে ইচ্ছুক নই। সেই কোন কাল থেকেই আমলের অবস্থা একই রকম। আগেও তাহাজ্জুদ পড়তাম না, এখনো পড়ি না। আগেও জুমাবারে আযানের সাথে সাথে মসজিদে যেতাম না, এখনো যাই না। আগেও তাড়াতাড়ি মসজিদে যেতাম না, এখনো না।

***

আমলের উন্নতির জন্যে সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো :

ক. সোহবত। সৎসঙ্গ। উম্মতের সেরা মানুষ সাহাবায়ে কেরামও সোহবতের কারণেই সেরা হতে পেরেছিলেন। আমলকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

খ. আমলের নিয়তে বুঝে হোক, না বুঝে হোক, কুরআন তিলাওয়াত করা। হাদীস শরীফ পড়া।

গ. বুযুর্গদের জীবনী পড়া। এটা অত্যন্ত ফলদায়ক।

ঘ. ওয়াজ-নসীহত শোনা। হক্কানী ওলামায়ে কেরামের।

ঙ. তাবলীগে যাওয়া। নিজের আমল ঠিক করার জন্যে বর্তমানে এর চেয়ে কার্যকর মাধ্যম আর কমই আছে। খুবই ভালো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তবে একজন ভালো আমীর পাওয়া জরুরি।

জীবন জাগার গল্প : ৬৬৯

পাঁচ টাকার বিলাই

বাবা মেষ চরাতেন। ছেলেও বাবার পেশাই নিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে দেখে দেখে শিখেছে। কীভাবে মেষপাল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কীভাবে নেকড়ে থেকে পুরো পাল রক্ষা করে আনা-নেয়া করতে হয়। কীভাবে মেষের দুধ দোহন করতে হয়। কীভাবে পশম কাটতে হয়। কীভাবে বাচ্চা প্রসব করাতে হয় ইত্যাদি।

বাবার মৃত্যুর পর পুরোনো মনিবের কাছেই চাকরি নিল। দিনে পাঁচ দিরহাম করে। এভাবেই চলছে। অত্যন্ত সততার সাথে কাজ করে যেতে লাগল। অন্য রাখালরা মনিবের মেষের দুধ খায়। চুরি করে পশম বিক্রি করে। কিন্তু সে ওসবের কিছুই করে না। পাঁচ টাকা মজুরি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বাবা মৃত্যুর আগে নসিহত করে গেছেন। আজীবন যেন হালাল রুজি খায়!

***

দেশে মড়ক দেখা দিল। গৃহপালিত প্রাণীগুলো একে একে মরে যাচ্ছে। রোগ নির্ণয় করা যাচ্ছে না। মনিব ঠিক করলেন, সব মেষ বিক্রি করে দেবেন। হাটবারে পাইকাররা বড় নৌকা নিয়ে আসে। তারাই কিনবে। তিনি ঠিক করেছেন, এ দেশে আর থাকবেন না। রাখালকে ডেকে বললেন :

-তোমাকে আর মেষ চরাতে হবে না। আজ রাতে ব্যবসায়ীরা এসে মেষ নিয়ে যাবে। তোমাদের পরিবার তো বংশানুক্রমে আমাদের সেবা করেছে। তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে আমার বেশ খারাপ লাগছে। কিন্তু কী আর করা! এই থলেটা নাও!

-এটাতে কী আছে মনিব?

-কিছু দিরহাম আছে, তোমার এনাম!

-জি না, মনিব! আমাকে শুধু আজকের মজুরি পাঁচ দিরহামই দিন। এর বেশি আমি নিতে পারব না!

-কেন? আমি তো খুশি হয়ে দিচ্ছি!

-আব্বু বলে গেছেন, পরিশ্রম করে উপার্জন ছাড়া কিছু গ্রহণ না করতে। এতে মনে লোভ সৃষ্টি হবে! অলসতা এসে যাবে!

***

রাখাল বাড়ি চলে এল। চিন্তা মাথায় নিয়ে। গ্রামে মেষচারণের সুযোগ নেই। সবাই মেষ বিক্রি করে দিচ্ছে। জমানো টাকাও নেই। যৎসামান্য যা আছে, বেশি দিন চলবে না। একটা বুদ্ধি করা যায়, গ্রামে মহাজন আছেন, তিনি তো মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসায় খাটান! তার কাছে গিয়ে দেখা যাক!

-মহাজন, আপনি এবার মাল কিনতে কখন বের হবেন?

-এই তো আগামী পরশু! কেন কিছু লাগবে? লাগলে বলো, তোমার জন্যে নিয়ে আসব! বেশি লাভ করব না।

-না বলছিলাম কি, সবাই তো আপনাকে পুঁজি দেয়! ভাবছিলাম এবার আমিও কিছু পুঁজি দেব!

-এবারের পুঁজিগ্রহণের খাতা বন্ধ করে ফেলেছি। যথেষ্ট পুঁজি গ্রহণ করা হয়ে গেছে। আর নেয়া যাবে না।

-দয়া করে আমার পুঁজিটা গ্রহণ করলে বড় উপকার হতো!

-তা কত তোমার পুঁজি?

-পাঁচ দিরহাম!

-হাসালে! এ টাকা দিয়ে কী পাওয়া যাবে? এত অল্প টাকায় কিছুই কেনা যাবে না!

-তবুও যদি পাওয়া যায়! না পেলে পাঁচ দিরহাম ফেরত দিলেই হবে।

-আচ্ছা, এত করে যখন বলছ, দাও!

***

ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে যথাসময়ে বের হয়ে গেলেন। খাতা মিলিয়ে সবার পুঁজি নিয়ে পণ্য ক্রয় করলেন। এবার ফেরার পালা। সব গোছগাছ শেষ। হঠাৎ মনে পড়ল, রাখালের পাঁচ দিরহামের কথা। ওহ্ হো! এখন কী করা যায়? পাঁচ দিরহাম দিয়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। তারপরও একবার বাজারে চক্কর দিয়ে আসা যাক! কিছুই পাওয়া গেল না। একটা বেড়ালই শুধু পাঁচ দিরহামে বিকোচ্ছে! বেড়ালের মালিক নাছোড়বান্দা হয়ে ধরল! দুষ্ট বেড়ালটাকে দেশছাড়া করতে পারলে বাঁচে! শুধু পাঁচটা দিরহাম দিলেই চলবে!

-এই বেড়াল দিয়ে কী হবে?

-এটা খুবই কাজের বেড়াল! ইঁদুর ধরায় এর জুড়ি মেলা ভার!
-তা হলে তুমি কেন বিক্রি করে দিচ্ছ?
-আমার বুড়ি বেড়ালকে খুব ভয় পায় তাই!

***

বেড়াল বগলদাবা করে ফিরল মহাজন। একটা খাঁচা বানিয়ে নিল। পথ চলতে চলতে অর্ধেক পথে এসে কাফেলা তাঁবু ফেলল। বিশ্রাম নেবে। টুকটাক ব্যবসাও করা যাবে। গাঁয়ের লোকেরা দেখল একটা মোটাসোটা বেড়ালও আছে। মহাজনকে ধরে বসল :
-বেড়ালটা আমাদের দিয়ে দিন! আমরা ইঁদুরের উৎপাতে থাকতে পারছি না!
-আমার বেড়াল ইঁদুর ধরায় বেশ পারঙ্গম! কিন্তু এটা কিনেছি আরেকজনের জন্যে! তার জিনিস আমি কীভাবে বিক্রি করি?
-না মহাজন সাব! বিক্রি আপনাকে করতেই হবে! আপনি কত টাকা চান বলুন! যা চাইবেন আমরা গাঁ-বাসী জোগাড় করে দেব!
-বেড়ালের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিলে বিক্রি করতে পারি!
-আমরা রাজি!

***

ব্যবসায়ী অবাক! কী থেকে কী হয়ে গেল। নিজ গ্রামে ফিরলেন। সবাই যে যার পণ্য নিয়ে ফিরে গেল। রাখাল এল সবার পরে। সংকোচ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল!
-ও, এসেছ! তোমার অপেক্ষা করছিলাম! বলো তো, এই পাঁচ দিরহাম তুমি কোথায় পেয়েছ?
রাখাল সব খুলে বলল। বাবার নসিহতের কথা বলল। মহাজন বললেন :
-হুম! বুঝতে পেরেছি, এটা তোমার নিয়তের বরকত! হালাল রিযিকের বরকত।

জীবন জাগার গল্প : ৬৭০

কিছু মানুষ এত ভালো কেন?

এক.

মানুষের মহত্ত্ব দেখার সৌভাগ্য সব সময় হয় না। মাঝেমধ্যে হয়। সেই মুহূর্তগুলো খুবই উপভোগ্য হয়। উপাদেয়। স্মরণীয়।

***

গতকাল আমরা বাস থেকে নেমে, টিটি পাড়া মসজিদে বসে আছি। সকাল থেকে তেমন কিছু পেটে না পড়ায় আমি ও দুই ছানা খুবই ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত। সাথে বাড়ি থেকে বানিয়ে দেয়া পিঠে ছিল।
তিনজনাতে পিঠে খেতে বসলাম। দুই ছানা ক্ষুধায় বুভুক্ষু হয়ে ছিল। খাওয়ার ধরন দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।

***

মসজিদের পাশেই একটা মাদরাসা। ছেলেরা পড়ছে। কচিকাঁচাদের কণ্ঠে, কুরআন কারীমের সুমধুর সুর ভেসে আসছিল।
দুজন শিক্ষক এলেন। আমাদের খোঁজ খবর নিলেন। কুশল বিনিময় করলেন। একজন দুপুরের খাবারের প্রস্তাব দিলেন। স্বাভাবিক কারণেই দাওয়াতগ্রহণে অপারগতা জানালাম। কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা হয়ে ধরলেন। এরপর আর না করা চলে না।

***

এটা একটা ভালো লাগার দিক। সাধারণত নিজেদের গণ্ডিতে নতুন আগন্তুক এলে, তার দিকে নজর রাখা, তার প্রয়োজনের প্রতি, সমস্যার প্রতি নিজ থেকে আগে বেড়ে খোঁজ নেয়া, বর্তমানে বিশেষ করে শহরের পরিবেশে দুর্লভ।

***

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই বিষয়টা বড় প্রকটভাবে ধরা পড়ে। একটা প্রতিষ্ঠানে গেলাম, কিন্তু একজনও আগ বেড়ে জানতে চাইল না—কেন এসেছি, কার কাছে এসেছি, কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। যার যার স্বার্থ নিয়ে লিপ্ত। অবশ্য সবাই এমন নয়। ব্যতিক্রম আছেন, সবার চোখ না পড়লেও, দু-একজন মানুষ এমন থাকেন যাদের চোখ ঠিকই পড়ে। এদের কারণেই পৃথিবীটা এখনো বসবাসযোগ্য। সুখের। আনন্দের।

দুই.

অনেক আগে, মাত্র হিফজখানা থেকে ফারেগ হয়ে উর্দু খানা, ফারসি খানা শেষ করেছি। এবার সরফ পড়ব। আমার উস্তায (মামা) ঠিক করলেন, আমাকে তার শায়খ, ভারতের জালালাবাদের হযরত, মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেবের দরবারে নিয়ে যাবেন।

***

সেমতে, মাদরাসার বার্ষিক পরীক্ষার পর, উস্তায-শাগরিদ (মামা-ভাগ্নে) রওয়ানা দিলাম। ঢাকায় যাত্রাবিরতি করলাম বসুন্ধরার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে। মাদরাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ইফতারের সময় পার হয়ে মাগরিবের জামাতও দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমরা গাট্টি-বোঁচকা রেখে সামান্য পানি মুখে দিয়েই মসজিদে চলে গেলাম।

নামায পড়ে রথ-হাত আর চলছিল না। মসজিদেই ক্লান্তিতে শুয়ে পড়লাম। একে তো রোজা, তায় আবার সারাদিনের পথশ্রম। আমার সেবারই প্রথম ঢাকায় আসা এবং সেটাই প্রথম দীর্ঘকালীন পথযাত্রা। সেই ছোট বয়েসে, বাসে উঠলে তো বটেই, বাস শব্দটা শুনলেও নাড়িভুঁড়ি খিঁচে বমি আসত। মনে হতো, জীবনের প্রথম দিন চুকচুক করে খাওয়া 'শালদুধ'টুকুও যেন বেরিয়ে আসবে!

***

মামা আর আমি শ্রান্তিতে মসজিদেই ঠাঁই নাড়া গেঁড়ে শুয়ে পড়েছি। এমন সময় একজন হুযুর সাথে একজন ছাত্র নিয়ে এলেন। ছাত্রটির হাতে ঠান্ডা পানির জগ, হরেকরকমের ইফতারি দিয়ে সাজানো প্লেট। আমরা দুজন বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

কারণ, আমরা ভেবে কূলকিনারা করতে পারছিলাম না, এই অসময়ে খাবারের কী ইন্তিজাম হবে। কারণ, সময়টা ছিল ১৯৯৪ সাল। তখন বসুন্ধরাতে সবে বাড়ি ঘর নির্মাণ শুরু হচ্ছে। পুরো আবাসিক এলাকাটাই ফাঁকা। একমাত্র মাদরাসাটাই আছে। দোকানপাট সে তো অনেক দূরে মূল রাস্তায়।

***

এমনি মুহূর্তে এই পাওয়া খাবার 'মান্না-সালওয়া' সমান মনে হলো। মামা সেই হুযুরকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন :

-হুযুর, এই খাবার কোত্থেকে এল?

-কেন মাদরাসার খাবার?

-আমাদের যে প্রয়োজন সেটা কীভাবে জানতে পারলেন? এখানে তো অনেক মানুষ!

এই প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তর দিলেন না, মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

***

আজ এত বছর হয়ে গেল। সেই কত ছোট বেলার কথা, কিন্তু এখনো সেই

মহৎ মানুষটার মিটিমিটি হাসিটুকু চোখে লেগে আছে।
তিন.
আমরা যারা গ্রামের কওমী মাদরাসায় পড়েছি তারা জানি, আমাদের মাদরাসাগুলোতে প্রতিবছর ধানের মৌসুমে ধান তুলতে হয়। আমিও প্রায় আট বছর ধান তুলেছি। প্রতিদিন গড়ে দশ-বিশটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতরাতে কাতরাতে ধান তুলেছি। শত কষ্টের মধ্যে অমানুষিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ হলেও, এখন মনে হয়, জীবনে যা কিছু ভালো কাজ করার তাওফীক আল্লাহ দিয়েছেন, সেই ধান তোলা তার অন্যতম।

***

মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলে আনা ধানগুলো বিক্রি করেই আমাদের গ্রাম-বাংলার গরিব মাদরাসাগুলোর পুরো বছরের অনেকটা খরচ ওঠে। অসংখ্য গরিব, এতিম, অসহায়, দুস্থ ছাত্রের দু-বেলা ডালভাতের ব্যবস্থা হয়। ভাবতেও দারুণ পুলক জাগে, আমার বিশ-ত্রিশদিনে পায়ে হেঁটে, ঘর্মাক্ত কলেবরে তুলে আনা ধান-চাল বিক্রি করা টাকায় কত কত গরিব তালিবে ইলম লেখাপড়া করতে পেরেছে! আফসোস হয়, আরও বেশি করে কেন মেহনত করিনি। তা হলে আরও কয়েক সের ধান-চাল বেশি উঠত। আরও কয়টা টাকা মাদরাসার ফান্ডে বেশি জমা হতো!
অনেকেই এভাবে ধান তোলা অপমানজনক মনে করে। এটাকে ভিক্ষা বলে আখ্যায়িত করে। তাদের যুক্তি হলো :
-নবীর ওয়ারিশদের কেন মাঠে-ঘাটে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে? তাদের রিযিকের ব্যবস্থা তো স্বয়ং আল্লাহই করবেন?
এমন মুত্তাকী, মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহদের আমি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। তর্কে যাই না। পক্ষে-বিপক্ষে কত যুক্তিই তো দেয়া যায়।

***

যাক, আমাদের জন্যে এই ধান তোলাটা ছিল পরম আনন্দের একটা বিষয়। এর মাধ্যমে আমরা গ্রাম বাংলার গণমানুষের সাথে সরাসরি মিশতে পারতাম। তাদের ভেতরের অবস্থা জানতে পারতাম। অল্প বয়েসেই অভিজ্ঞতার ঝুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে যেত।
ওই আট বছরে শত শত মজার, ব্যথার স্মৃতি আছে। ধান তুলতে গেলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা দেখা দিত সেটা হলো দুপুরের খাবার।

সকালেরটা তো খেয়ে বের হতাম। রাতের খাবার ফিরে এসে খেতাম। দুপুরে চলার ওপরে, হাঁটার মধ্যে থাকতাম। খাব কোথায়? এই দুপুরের খাবার ঘিরেই বেশির ভাগ স্মৃতি।

***

একদিন প্রচণ্ড রোদ, কাঠফাটা গরম। সকালে নাস্তার সুযোগ হয়নি। আমীর সাহেবের কাছে টাকা ছিল না। দূরের পথ হওয়ার কারণে ফজরের আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। তাই মেজবান বাড়িতে সকালের খাবারটার ব্যবস্থা হয়নি। সেই ফজরের পর থেকে খালি পেটে, ক্ষুধা নিয়েই ধান তোলার কাজ শুরু হলো। 'কোরা' হাতে নিয়ে ঘুরছিলাম। বারোটা বাজার পর আর পা চলছিল না। তবুও ধুঁকে ধুঁকে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলাম।

***

মাথার ওপর ছাতিফাটা রোদ। আবার সেই রতনপুর গ্রামটাতে কেন যেন গাছপালাও কম। একটা বাড়িতে গিয়ে আমি আর আব্দুল করীম নলকূপ থেকে গোগ্রাসে পানি গিলছিলাম। কিছু চাল উঠেছিল, সেগুলো থেকে একমুঠো তুলে নিয়ে চিবুচ্ছিলাম। তাতে যদি ভাতের ক্ষুধা কিছুটা হলেও কমে! চোখের সামনে যেন জোনাকি পোকার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু উড়ছিল। ক্ষুধার মাত্রা এতটাই বেশি ছিল।

আমাদের ভরদুপুরে নির্জলা চাল চিবুতে দেখে, এক বুড়ি এগিয়ে এল। সস্নেহে বলল :

-তোমরা তো বোধহয় দুপুরে ভাত খাওনি!

-জি না।

বুড়ি আমাদের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। খুবই জীর্ণশীর্ণ একটা ঘর। শনের ছাউনি। জায়গায় জায়গায় চাল ফাঁক হয়ে আছে। মাটির মেঝে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, বৃষ্টি এলে হড়হড় করে ঘরে পানি পড়ে। মাটিতে পানির ফোঁটার গর্ত গর্ত দাগ হয়ে আছে।

বুড়ি হন্তদন্ত হয়ে একটা চিকন বাঁশ নিয়ে রান্নাঘরের পেছন দিকে ছুটে গেলেন। আমরা ভাঙা দরজার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, গাছ থেকে একমাত্র পেঁপেটা পাড়ছেন। অতি দ্রুত হাতে পেঁপেটা ফালি ফালি করে কুটে আমাদের খেতে দিলেন। একটু পরে একটা ছোট্ট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল। এসেই হড়বড় করে বলল :

-দাবিয়া (দাদু)! ভাত দাও।

বুড়িকে দেখলাম বিহ্বল চোখে নাতির দিকে চেয়ে থাকতে। পরক্ষণেই কী

যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে ঘরের ভেতরে ছুটে গেলেন। একটা ঝনঝনে আওয়াজ এল। আমরা দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম বুড়ি একটা মাটির টাকা জমানোর ব্যাংক আছড়ে ভেঙে ফেলেছেন। এখন মাটিতে পড়ে থাকা সবক'টা পয়সা কুড়িয়ে হাতে নিয়ে গুনছেন।

সব মিলিয়ে, চার আনা আর আট আনা দিয়ে বোধহয় তিন টাকা হলো। নাতির হাতে টাকাটা দিয়ে বললেন :

-যা তো ভাই, এক দৌড়ে গিয়ে একটা ডিম নিয়ে আয়!

ডিম ভাজা হলো। আমাদের বুড়িমা পরম আদরে, মাটির শানকিতে করে, সেই ভরদুপুরে হাঁড়ির তলা কাঁচিয়ে পান্তা ভাত বেড়ে দিলেন। আমরা জোর করে নাতিকেও বসালাম। না না করলেও, আমাদের চাপাচাপিতে সে বসল। বুঝতে পারছিলাম, এই অল্পক'টা পান্তাভাত আজ দুপুরে দাদি-নাতির খাবার ছিল। আমরা খেয়ে ফেলার পর, বুড়িকে নিরম্বু উপোস দিতে হবে। আবার আমরা না খেলে বুড়িমা কষ্ট পাবেন। তাই মুখ বুজে খেয়ে নিলাম। কত বড়লোকের বাড়িতেই তো সেদিন গিয়েছিলাম। কই, কেউ তো খেতে বসায়নি! জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, বুড়ি একাই নাতিকে নিয়ে থাকেন। ছেলে আর বউ মারা গিয়েছেন সেই কবে! দাদিই নাতিকে একদম ছোট্ট থেকে বড় করেছেন। দুজনেরই আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। খেতি-জমি নেই। বৃদ্ধ বয়েসে লোকের বাড়ি গিয়ে আগের মতো কাজ করতে পারেন না। কোনোরকমে চাটাই বানিয়ে বিক্রি করে দিন চলছে।

বিদায়ের সময় আব্দুল করীম হাউমাউ করে কেঁদে দিল। বুড়ির চোখেও টলোমলো অশ্রু। অল্প সময়েই এই মায়া কোত্থেকে এল?

আমি আর আব্দুল করীম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। জীবনে যদি কখনো তাওফীক হয়, এই বুড়িকে ভুলব না। এত এত বড় হৃদয়!

***

আহ! কিছু মানুষ এত ভালো কেন?

জীবন জাগার গল্প : ৬৭১

নবীওয়ালা আদব!

ঈসা আ.-এর প্রতি তো আমার ঈমান রাখতে হবে। সেটা আমার সরকারি (ঈমানী) দায়িত্ব। না হলে ঈমান থাকবে না। কিন্তু এর বাইরেও তাকে আমার ভালো লাগে। তিনি খুবই মুআদ্দাব। আল্লাহর সাথে কথা বলার

সময় তিনি খুবই আদব-লেহাজের সাথে কথা বলতেন। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে। সূরা মায়িদার এক শ ষোলো নম্বর আয়াত। আল্লাহ ঈসাকে জেরার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন :

-ঈসা, তুমিই কি লোকদের বলেছ, তোমরা আমাকে এবং আমার আম্মুকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো?

তিনি উত্তর কী দিলেন, সেটা বলার আগে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, আল্লাহর দরবারে নবীগণও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবেন, তা হলে আমাদের কী অবস্থা দাঁড়াবে? ওরে আল্লাহ রে!

আমাকে কেউ যদি সরাসরি প্রশ্ন করে :

-অ্যাই, তুমি কি এ কাজটা করেছ?

আমি সাথে সাথে মুখের ওপর বলে দেব :

-নাহ, আমি করিনি।

কিন্তু ঈসা আ. উত্তরটা কীভাবে দিলেন? তিনি আমাদের মতো বলেননি :

-নাহ, আমি এমন কথা বলিনি।

তিনি উত্তর দিয়েছেন:

-আমি এমন কথা বলে থাকলে, সেটা তো আপনার জানা আছে। আপনি আমার মনের খবর জানেন। আপনিই তো গাইবের মহাজ্ঞানী।

= তার মানে বড় কেউ প্রশ্ন করলে, সরাসরি মুখের ওপর উত্তর না দেয়াটা নবীওয়ালা আদব।

***

ফেরাউনের আহ্বানে জাদুকররা এল। জাদু দেখাল। সবাই দেখল। ফেরাউনও দেখল। কিন্তু ঈমান আনল শুধু জাদুকররা। রাষ্ট্রপক্ষের কেউ ঈমান আনল না। এক যাত্রায় দুই ফল কেন?

বুযুর্গরা বলেন :

-এর কারণ হলো, নবীর প্রতি আদব।

কীভাবে? জাদুকররা ছোট্ট একটা সৌজন্য দেখিয়েছিল আল্লাহর নবী মুসার প্রতি।

-আপনিই কি আগে নিক্ষেপ করবেন, নাকি আমরা?

ব্যস, হয়ে গেল। আল্লাহর তাদের জন্যে হেদায়াতের ফয়সালা দিয়ে দিলেন। একটু পরই হেদায়াত জুটেও গেল।

এ জন্যেই বুযুর্গানে কেরাম বলেন :

-ইলম তো জরুরি, তবে আদব আরও বেশি জরুরি।

***

উসমান রা.-এর বিষয়টা আমাকে একেবারে নির্বাক করে দেয়। কুয়েতের বিশিষ্ট বক্তা, ড. তারেক সুয়াইদানের একটা বক্তব্যে শুনেছিলাম :

=উসমান রা. যে হাত দিয়ে নবীজির কাছে বায়আত নিয়েছিলেন, সে হাত দিয়ে বাকি জীবনে আর কখনো লজ্জাস্থান স্পর্শ করেননি!

= এমন ঘটনা একটা-দুটো নয়, অসংখ্য। সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে যে কত কতভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তারা নবীজির সাথে কত আদবের সাথে উঠাবসা করতেন!

***

গারে সাওরে আবু বকর রা.-এর কথা তো সবারই জানা।

ইশ! এভাবে যদি মুরুব্বিদের প্রতি আদব দেখাতে পারতাম! এভাবে যদি নবীকে ভালোবাসতে পারতাম!

জীবন জাগার গল্প : ৬৭২

ব্যবসা-বুদ্ধি!

বনেদি ব্যবসা। চাল-ডালের আড়ত। যুগের চাহিদার সাথে তাল রেখে, ইলেকট্রনিক্স পণ্যেরও একটা দোকান খোলার সিদ্ধান্ত হলো। বাজারে এখনো এ খাতে আলাদা করে দোকান হয়নি। খুচরা যন্ত্রপাতি বিক্রি-বাট্টা হয়। বড় করে শো-রুম দিলে বেচাকেনা ভালো হবে বলে ধারণা। বর্ধিষ্ণু এলাকা।

***

ছেলে পড়াশোনা করছে। বংশে এই প্রথম কেউ উচ্চশিক্ষার গণ্ডি পার হলো। ব্যবসাবিষয়ক আরও উচ্চশিক্ষার জন্যে ছেলে বিদেশ যাওয়ার বায়না ধরল। বাবা শুরুতে অমত করলেও ছেলের মুখ চেয়ে রাজি হয়ে গেলেন। এক শর্তে।

-তোকে ফিরে আসতে হবে! পিতৃপুরুষের ব্যবসার হাল ধরতে হবে।

-তা-ই হবে আব্বু!

***

ছেলে চলে গেল। ছুটিতে বেড়াতে এল। বাবার আগ্রহ আর মায়ের

তাকিদে ছেলে একবেলা দোকানে বসতে লাগল। বাপ-দাদার ব্যবসা যেহেতু সে-ই দেখবে ভবিষ্যতে, এখন থেকে একটু-আধটু বুঝে নিলে সমস্যা কী!

রক্তে যার ব্যবসা, তার ব্যবসা বুঝাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। বেগ পেতে হলোও না। খুব দ্রুতই সবকিছু বুঝে নিতে শুরু করল। শিখেপড়ে নিতে লাগল। বাবা বেজায় খুশি। ছেলে এবারের ছুটিতেই অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তিনি আর ক'দিন থাকবেন! যার ব্যবসা তাকেই হাল ধরতে হবে।

***

দোকানের নিয়ম অনুসারে প্রতিমাসে একবার মাসকাবারি হিশেব টানা হয়। আজও বসা হলো। দোকানের কর্মচারীরা ভীষণ উত্তেজিত। প্রতিমাসেই কিছু না-কিছু গরমিল হয়ই। কোনো মাসে চোর ধরা পড়ে, কোনো মাসে ধরা পড়ে না। ছেলে অদূরে বসে হিশেব টানা দেখছে। অবাক হয়ে দেখল হিশেব শেষ করার পর বাবা বেশ কিছু টাকা আলাদা করে ফেললেন। নিত্যব্যবহার্য কয়েকটা গৃহসরঞ্জামও আলাদা করে রাখলেন। কৌতূহলী হয়ে দেখে যাচ্ছে, বাবার কাণ্ড-কারখানা কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। যথাসময়ে দোকান বন্ধ হলো। বাবা আলাদা করে রাখা টাকা আর পণ্যগুলো একটা ব্যাগে ভরে রাস্তায় নামলেন। ছেলেকে সাথে নিয়ে বাজারের পশ্চিম মাথায় চলে গেলেন। সেখানে অনেক গরিব পরিবার বাস করে। দরজায় টোকা দিয়ে দিয়ে তিনি সাথে নিয়ে আসা গৃহসামগ্রী আর টাকাগুলো বিলি করে গেলেন।

***

বিতরণ শেষে বাপ-বেটা ঘরে ফিরল। পথে কোনো কথা হলো না। ছেলের মনে জিজ্ঞাসা! এভাবে করলে ব্যবসা টিকবে? পরদিন নাশতা করতে করতে কথা হচ্ছে। বাবা বললেন :

-গতকাল তোমাকে দেখে মনে হয়েছে, তোমার মনে কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে?

-জি! এভাবে দোকানের পণ্য দান করলে ব্যবসার ক্ষতি ছাড়া লাভ হওয়ার কথা নয়। মোটা অংকের নগদ টাকাও সরিয়ে আনা হয়েছে। ব্যবসার কাঁচা টাকা এভাবে অলাভজনক ভিন্নখাতে ব্যয় হয়ে গেলে, একসময় মূল পুঁজিতে টান পড়তে বাধ্য!

-ব্যবসার কোনো ক্ষতি হবে না, এটা তুমি নিশ্চিত থাকো!
-কীভাবে? প্রতিমাসেই কি এভাবে দান করা হয়?
-জি। তোমার দাদার আমল থেকেই এটা চলে আসছে!

-আমি রাতে হিশেব করে দেখেছি, বছরে বারো মাস। প্রতিমাসে এ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ব্যয়টা যদি না করা হতো, তা হলে আমাদের মূলধন আরও বেশি হতো! স্বাভাবিক ব্যবসা-বুদ্ধির অধিকারীও এটা বুঝবে!
-আচ্ছা, এসব হিশেব-নিকেশ করার আগে আমাকে বলো, দেশে গরু বেশি না কুকুর বেশি?
-গরু!
-গরু বছরে কয়টা বাছুর প্রসব করে আর কুকুর কয়টা?
-গরু করে একটা আর কুকুর করে তিন থেকে চারটা, কখনো আরও বেশিও প্রসব করে।
-মানুষ প্রতিদিন কি গরুর জবাই করে খায় না কুকুর?
-গরু!
-তা হলে তোমার ভার্সিটির ব্যবসা-বুদ্ধি কী বলে? দেশে গরুর সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা নাকি কুকুরের!
-কুকুরের!
-বাস্তবে কি তা-ই?
-জি না।
-বাছা, এবার বুঝবে! এখানেই হালাল ও হারামের পার্থক্য। হালাল জিনিস ব্যয় করলে কমে না; বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়ে দেন। কৃপণতা ও দানশীলতার পার্থক্যও এমন। তোমাদের পুঁথি-পুস্তকের জ্ঞান অনুসারে আমাদের মাসকাবারি দানের কারণে, ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। মূলধন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের জ্ঞান বলে ভিন্ন কথা! কুরআন বলে তুমি যত দান-সদকা করবে, তোমার সম্পদ তত বৃদ্ধি পাবে! দানে সম্পদ বাড়ে; কমে না। বুঝলে বাছা!